KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : সমকালীন সাহিত্য সংস্থা
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ১/- ৩/- ৩/- ৩/-	Year of Publication : ফাল্গুন, ১৩৬২ শ্রাবণ, ১৩৬২ মাঘ, ১৩৬২ বৈশাখ, ১৩৬২
	Condition : Brittle / Good
Editor : সৌম্যেন্দ্র শঙ্করভট্টাচার্য, নারায়ণ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C 3507 -/8/- Phone: 23-5155 SAMAKALIN

সমকালীন

সম্পাদক
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ● নারায়ণ চৌধুরী

তৃতীয় বর্ষ চৈত্র ১৩৬৯

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

তৃতীয় বর্ষ চৈত্র ১৩৬২

পরিচালক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

সমকালীন
তৃতীয় বর্ষ, চৈত্র, ১৩৬২

বাংলার সমাজ

নারায়ণ চৌধুরী

'বাংলার সমাজ' কথাটি ব্যাপক। স্বল্প পরিসরে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভবপর নয়। আমি শুধু এখানে গত দুশো বছরে বাংলার সমাজ বিবর্তনের মূল ধারাটিকে লক্ষ্য ও নির্দেশ করতে চেষ্টা করব।

ভারতীয় সমাজের গড়ন মুখ্যতঃ কৃষিকেন্দ্রিক। এদেশের মানুষের ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তা রীতিনীতি এবং জীবনযাত্রাপদ্ধতি কৃষির সংস্কারকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এবং এখনও পর্যন্ত এই বিশেষ মনোভঙ্গীটিই আমাদের ভিতর বলবৎ। ভারতের সকল অঞ্চলের পক্ষেই এ কথা সত্য। বাংলা দেশের পক্ষেও। যদিও বাংলা দেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আগে এসেছে এবং সেই সূত্রে ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব কিছুটা আত্মসাৎ করে নিয়েছে, তা হলেও এর দ্বারা বাংলার কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ কোন নড়চড় হয় নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার ঘাত-বেয়ে-আসা আধুনিক নাগরিক মনোভাব আমাদের জীবনের বহিরঙ্গকে মাত্র স্পর্শ করেছে, আমাদের জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি। পাশ্চাত্যসভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, ওই পরিবর্তন নগরের সীমাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামজীবনের উপর তা আঁচড় কাটতে পারে নি। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি আন্দোলন একান্তভাবে নগর-নির্ভর আন্দোলন, এর সঙ্গে পল্লী বাংলার বিশেষ যোগ ছিল না বললে আশা করি আন্দোলনের গুরুত্বকে খর্ব করা হয় না। উনিশ শতকের নবজাগৃতি আন্দোলনের নগর-নির্ভরতার আরও একটি কারণ বর্তমান। আন্দোলনের প্রকৃতি অনুধাবন করলেই কারণটি বোঝা যাবে। উনিশ শতকের বাংলায় বহু মনীষীর উদয় হয়েছিল, তাঁদের শক্তি ও প্রতিভা নানা দিকে বিকশিত হয়ে উঠেছিল সে কথাও ঠিক, কিন্তু দুই-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁদের প্রায় সকলেরই সাধনার লক্ষ্য ছিল আত্মোন্নয়ন—আধ্যাত্মিক এবং মানসিক। যাকে আধুনিক পরিভাষায় গণসংযোগ বলে,

জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়া বলে—এ মনোভঙ্গি তখন আদপেই গড়ে ওঠে নি। এ জিনিস সম্পূর্ণই বিংশ শতাব্দীর দান। বিশ শতকের রাজনৈতিক সচেতনায় এ মনোভাবের উদ্ভব এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যাপ্তি। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বপ্রথম মহাত্মা গান্ধী গণসংযোগের আদর্শকে সুস্পষ্ট করে তোলেন। দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অভাব-অভিযোগ, দাবী-দাওয়াকে তিনি তাঁর গণ-আন্দোলনের মধ্যে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। গান্ধীজীই প্রথম গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে ভারতের প্রকৃত আত্মা তার গ্রামে নিহিত। আমরা কিছু সংখ্যক মানুষ নগরে বাস করি বটে এবং নাগরিক জীবনের রীতিনীতি পদ্ধতিপ্রকরণ আমাদের মোটামুটি বাস্তত্ব হয়ে গেছে সে কথাও ঠিক কিন্তু তা দেশের প্রকৃত ছবি নয়। ভারতবর্ষীয় সমাজের যথার্থ রূপ নিহিত রয়েছে তার অগণন সংখ্যক গ্রামের ভিতর। গ্রামীণ সমাজকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে ভারতের কিংবা বাংলার কোনরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনাই সম্ভব নয়। গ্রামসমাজের জীবনযাত্রার ভিতর বহুতর অসম্পূর্ণতা সঙ্কীর্ণতা আছে মানি, তাবলে বাস্তব সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ভারতবর্ষীয় সমাজের পরিচয় লাভ করতে হলে ভারতের এই গ্রামমুখ্য সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোটিকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

স্পষ্টই বোঝা যায় গ্রামজীবনের উপর জোর দিতে গিয়ে গান্ধীজী প্রকারান্তরে ভারতীয় মানসের কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কারটির উপরই জোর দিতে চেয়েছিলেন। এখন, এই কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কার বলতে কী বোঝায় সেটি একটু স্পষ্টীকৃত করে নেওয়া দরকার। কৃষির সংস্কার বলতে বোঝায় সারল্যের সংস্কার, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সংস্কার, সততা সাধুতার সংস্কার। শান্ত ও স্থির ভাব এই মনোভাবের মূলে গ্রথিত রয়েছে। নগরজীবনের ব্যস্ততা, উৎক্ষেপ, অধিকার ও জটিলতা থেকে কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা বহু দূরে অবস্থিত। যাঁরা অতিমাত্রায় নাগরিকতার উপাসক তাঁরা হয়তো বলবেন যে গ্রামজীবনের সঙ্গে বহুবিধ ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়ানো রয়েছে। কিন্তু গ্রামজীবনের এই ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেনে নিয়েও বলা যায় যে গ্রামজীবনের মানুষ মূলতঃ শান্তরসের সাধক। নগরজীবনের কোলাহল, মত্ততা, হৃদয়হীনতা ও ক্রূরতা গ্রামে অনুপস্থিত। শিল্পোন্নয়নের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সচ্ছল জীবনযাত্রার নানাবিধ উপকরণ নগরের সীমার মধ্যে আমরা লাভ করতে পেরেছি বটে, কিন্তু এর জন্য আমাদের মূল্যও বড় কম দিতে হয় নি। শহরের সুখসুবিধা ভোগের মাশুল স্বরূপ আমরা আমাদের মনের শান্তিটিকে নাগরিকতার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছি। গ্রামজীবনের আর যত দোষই থাক, মনের শান্তি এমন নির্মম ভাবে সেখানে সংকুচিত হয়ে নেই। আর্থিক কৃচ্ছ্রতার কারণে যতই খণ্ডিত ভাবে হোক সেখানে এখনও প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয়তার মনোভাব বিদ্যমান আছে, আছে পরের দুঃখে দুঃখানুভবের সহজ মানবীয় অভ্যাস। যে কোন সমাজ-ব্যবস্থার গোড়ার কথা হচ্ছে এই প্রতিবেশিপরায়ণতা। শহরজীবনের জটিলতার মধ্যে এই জিনিস হারিয়ে গেছে। কাজেই শহরের মানুষ নাগরিক শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হলেও সামাজিকতার দিক দিয়ে

খুব বেশীদূর অগ্রসর হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। বরং এ ক্ষেত্রে শহরের উপর পল্লীর সুস্পষ্ট জিৎ।

আর, পল্লীজীবনের কুসংস্কারগুলিকেও বহুমূল মনে করবার কোন কারণ নেই। শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কারের প্রভাব কমে আসতে বাধ্য। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত পল্লীসমাজের মানুষের মধ্যে যে-জাতীয় চিত্ত-সঙ্কীর্ণতার বর্ণনা আছে তা নিতান্তই অশিক্ষা এবং আলস্যের ফল। উদার শিক্ষার সাহায্যে গ্রামবাসীর এই জড়তা দূর করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

২

বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগরণ ইংরেজ অভ্যুদয়ের পরবর্তী ঘটনা।—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় এই শ্রেণীর উদ্ভব, নগরজীবনের প্রসারে এর বিকাশ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর অবসানও নিতান্ত আসন্ন বলে মনে হয়। বাংলা দেশের গত দুশো বছরের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটি বুঝতে হলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসটিকে আমাদের বুঝতে হবে।

ইংরেজ আমলের পূর্বে আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলে কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না, এ কথা সকলেই জানেন। তখন সামন্ততন্ত্রের যুগ। সামন্ত-ব্যবস্থার এক প্রান্তে ছিল রাজা কিংবা নবাব বা তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় ভূমাধিকারী প্রভুর দল, অন্য প্রান্তে কৃষক সম্প্রদায়। মাঝখানে কোন তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব ছিল না। ইংরেজ শাসনে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় কতিপয় শাখাপ্রশাখাযুক্ত একটি মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। জমিদার এই সম্প্রদায়ের মাথা, আর অন্ধপ্রত্যন্তের মধ্যে রয়েছে জোতদার, তালুকদার, দরপত্তনীদার, বর্গাদার প্রভৃতি স্তরিভোগী শ্রেণীর মানুষেরা। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্ম এই সূত্রেই। পূর্বকথিত শ্রেণীগুলির একটা অংশ ভূসম্পত্তির দিক দিয়ে ক্রমশঃ হীনবল হতে হতে এক সময়ে গ্রাম থেকে ছিটকে শহরের সীমায় এসে পড়ল। যে ভূমিব্যবস্থা এতকাল এঁদের প্রাণধারণের রসদ জুগিয়ে এসেছিল তাতে টান ধরায় জীবিকার সন্ধানে এঁদের শহরের দিকে অভিযান। শহর এঁদের জীবিকার সন্ধান দিল। ইংরেজী রীতিনীতির সংস্পর্শে আসার পর থেকে আমাদের শহরজীবনের সীমা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল, তদনুপাতে জীবিকার নূতন নূতন ক্ষেত্রও অনেক তৈরী হয়ে চলেছিল, সুতরাং শহরের সীমায় ছিটকে-পড়া এই মানুষগুলির জীবিকার প্রশ্নে খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি। তা বলে এই নূতন সৃষ্ট সম্প্রদায় একেবারে ভূমিবিচ্যুত হয় নি। এঁদের পল্লীর সঙ্গে এই সেদিনও পর্যন্ত যোগ ছিল। এঁরা জীবিকার প্রয়োজনে বাস করেছেন শহরে, কিন্তু প্রাণধারণের উপযোগী অর্থের একাংশ আহরণ করেছেন গ্রামের তালুক-মুলুক থেকে। ভূমি থেকে বিচ্যুত হলেও ভূমিনির্ভরতা এঁদের পুরোপুরি কাটে নি। এই ভাবেই বাংলা দেশে নাগরিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব।

এই সম্প্রদায়ের ভিতর উকীল, ডাক্তার, কেরাণী, অধ্যাপক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার,

দালাল প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষেরা রয়েছেন। ইংরেজীতে এঁদেরই বলা হয় professional classes, কেননা এক-একটি প্রফেশনকে কেন্দ্র করে এঁদের জীবনযাত্রার রীতি ও আদর্শ গড়ে উঠেছে। এঁদের চিন্তাকল্পনার গড়নের মধ্যে শুধু স্বশ্রেণীর নয়, স্বীয় বিশেষ বৃত্তিটির ভাবনাচিন্তার ছাপ রয়েছে। মধ্যবিত্ত নীতিবৃদ্ধির দ্বারা এঁদের জীবন নিয়ন্ত্রিত। এঁরা সজ্ঞাত ভাবে সৎ, পরিশ্রমী, সক্ষিষ্ণু, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল নন। হাওয়ার গতি অনুযায়ী এঁদের ভাবধারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে। দেশে যখন যেরূপ অবস্থা বিদ্যমান তদনুযায়ী কখনও এঁরা অভিজাততন্ত্রের স্বার্থের পরিপোষক, কখনও এঁরা শ্রমিক-কৃষক জাগরণেই উদ্গাতা। স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থবুদ্ধি অনুযায়ী এঁদের বিশ্বাসের ক্ষেত্র ঘন ঘন বদল হয়ে থাকে। দোদুল্যমানতা এঁদের মজ্জায় নিহিত।

এই তো গেল বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের চেহারা। আর যাঁদের ভূমির সম্বল নেই, গ্রামজীবন থেকে নিষ্ক্রিপ্ত হয়ে একান্তভাবেই যাঁরা শহরকে আঁকড়ে ধরেছেন, চাকরি-বিষয় কিংবা অনুরূপ অন্যবিধ ক্ষুদ্র জীবিকা ছাড়া যাঁদের বাঁচবার উপায় নেই তাঁরাই হলেন রাজধানী এবং মফস্বল শহরগুলির অগণিত সংখ্যক নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। কেরানী, শিক্ষক, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, দোকানদার, দালাল, ফিরিওয়ালা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষের দ্বারা এই সম্প্রদায়ের কলেবর পুষ্ট। অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতা ও অনৈশ্চিত্যের পীড়নে এঁদের জীবনযাত্রা সর্বদাই টলটলায়মান। বরাতজোরে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অর্থের সুসার হেতু মধ্যবিত্তের কোঠায় প্রমোশন পান, কিন্তু অধিকাংশেরই গতি নিম্নদিকে। অর্থাৎ স্বশ্রেণীর কোঠা থেকে পিছলে নীচের দিকে নেমে যাবার ঝোঁক। সমসাময়িক বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনে এই শ্রেণী থেকে প্রেণাস্ফরিত হওয়ার প্রক্রিয়া নিত্য চলছে। আজ যিনি ছিলেন ক্ষুদে কেরানী বা ব্যবসায়ী তাঁরই সন্তান-সন্ততিকে কাল দেখা যাচ্ছে কালিকুলি মাখা কারখানার কর্মীরূপে। নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে খারিজ হয়ে কত কত মানুষ যে প্রতিনিয়ত শ্রমিক শ্রেণীর খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হচ্ছে তার আর লেখাজোখা নেই।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়তি একেই বলে। এই নিয়তির আঘাত-সংঘাত অতিক্রমণের সাধ্য কারও নেই। উনিশ শতকের প্রসার্যমান ঔদার্যবাদের আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা নাগরিক অভিজাত সমাজের বর্তমান দুর্দশার মধ্যে এ-কথার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। আইনের দ্বারা জমিদারী-ব্যবস্থা রদ হওয়ায় ভূমিনির্ভর অভিজাত সম্প্রদায় যে প্রচণ্ড একটি মার খেয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। পল্লীর অনুপস্থিত শহরবাসী অভিজাতেরা অর্থাৎ absentee landlord-এর দল এক সময়ে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির বপ্তে আনুকূল্য করেছেন, তাঁদের হাতে ক্ষমতা থাকলে তাঁরা হয়তো আজও শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদির পোষকতা করতেন। কিন্তু ভাগ্য আজ তাঁদের উপর নিতান্ত বিরূপ। রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির রদবদল হওয়ায় তাঁদের অবস্থারও রদবদল হয়েছে। যে ভূমি এতকাল তাঁদের আরাম স্বাচ্ছন্দ্য এবং শিল্পপ্রীতির রসদ জুগিয়ে এসেছে সে ভূমির মালিকানা এক্ষণে প্রেণান্তরে অর্পিত। মধ্যপদের বিলোপে সরকার এবং ভূমিজীবী কৃষকদের মধ্যে এক্ষণে প্রত্যক্ষ

সমাস সাধিত হয়েছে। এতাবৎকালীন মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ঘটেই পারে না। কংগ্রেস সরকারের জমিদারী রদ ব্যবস্থার ক্ষতিপূরণ দানের সর্তটি নিয়ে আমাদের মনে যতই ক্ষোভ থাকুক এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে জমিদারী রদ বাংলার ভূমিব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। দুদিন আগে হোক পরে হোক বাংলার সমাজদেহের উপর এর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। দু একটি পরিবর্তন-লক্ষণ আজকের দিনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অভিজাতসমাজের হাত থেকে নায়কত্ব উত্তরোত্তর বৃহদ্ধর্মায়ী এবং শিল্পপতি শ্রেণীর মানুষদের হাতে চলে যাচ্ছে। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আভিজাত্যের নূতন মান, নূতন ধ্যানধারণা তৈরী হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে নীল ও সহবতের নূতন কানুন। শিল্পপতির দল যতই কেন না upstart হোন, ভূমিনির্ভর অভিজাতরা সচকিত হয়ে লক্ষ্য করছেন ওই হঠাৎ-গজানো নূতন মানুষেরাই অর্থকৌলিন্যের জোরে নূতন সমাজে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। কুষ্ঠীগীরগণ কুঁইকোঁড়দের কাছে ক্রমাগত হেরে যাচ্ছেন।

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুএক কথা বলা প্রয়োজন। বাংলার গত পৌনে দুশো-দুশো বছরের সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন জমিদার শ্রেণীর অভিজাত মানুষেরা আর তার অনুশীলনকারী ছিলেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। শহরের বৃত্তিজীবী শ্রেণীর লোকদের হাতেই এতাবৎ শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদি সুকুমার কলার সবিশেষ চর্চা হয়েছে এবং এ বাবদে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে যে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ ছিল তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নানা লক্ষণদৃষ্টে মনে হয় মধ্যবিত্তের এই প্রগতিশীল ভূমিকা ক্রমসংকুচিত হয়ে আসছে। তাঁদের যা দেবার ছিল তা প্রায় তাঁরা ঝেড়েমুড়ে দিয়েছেন, তাঁদের ক্ষমতার থলেতে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। মধ্যবিত্তের সৃজনী তৎপরতায় স্পষ্টই আজ ভাটার টান লেগেছে। রবীন্দ্রনাথ নূতন কবির বাণী লাগি' কান পেতে ছিলেন, মাটির কাছাকাছি সেই কবিকে তিনি দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু মনে হয় সেই প্রত্যাশিত নূতন কবিসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের আর অধিক বিলম্ব নেই। নূতন যুগের রুচি আর আশা-আকাঙ্খার প্রতীকস্বরূপ নূতন শিল্পীসমাজ আত্মপ্রকাশের সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। তাঁদের আত্মপ্রকাশ ত্বরান্বিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মধ্যবিত্ত সমাজের ভাগ্যের এই প্রতিকূল পরিণতিতে বিমর্ষ হওয়ার কিছু নেই। সমাজজীবনের একটি মূল কথাই হল শ্রেণীর বিবর্তন। সমাজবিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট স্তরে একটি বিশেষ শ্রেণীর আধিপত্য ঘটে, তার আবির্ভাব প্রতিষ্ঠা ও ক্ষয়ের মধ্যে একটা পূর্বাপর সঙ্গতি আছে। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই সেই শ্রেণীর বিলয় ঘটে। বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের সম্পর্কে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবার কোনই কারণ নেই। বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ তার বিকাশের যুগে জাতীয় জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। শিক্ষায় দীক্ষায় শিল্পভাবনায় রুচির পারিপাট্যে ও নীতিবুদ্ধিতে মধ্যবিত্ত সমাজের তুল্য অগ্রসর এবং প্রগতিশীল সম্প্রদায় আমাদের দেশে আর একটিও হয়নি। কি শিক্ষা, কি সাহিত্য, কি ধর্ম, কি রাজনীতি, কি সমাজসেবা—যেখানেই মধ্যবিত্তের উদ্যমের স্পর্শ ঘটেছে, তা-ই ফুলেফলে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। বাংলার উনিশ শতকের মূল প্রেরণা

ছিল ধর্ম, বিশ শতকের প্রবহমান প্রবণতা হল রাজনীতি—প্রথম তিন দশকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, শেষ সার্ধ দুই দশকে সমাজতন্ত্রী রাজনীতি। তবে ধর্মই হোক আর রাজনীতিই হোক এ দুয়েরই অগ্রনায়ক ছিলেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজ বাংলার জাতীয় জীবনে যে সমৃদ্ধ দান রেখে গেলেন তার জন্যে সঙ্গত ভাবেই তাঁরা অপরিমিত গৌরব বোধ করতে পারেন।

কিন্তু ভুললে চলবে না সমাজদেহের বিভিন্ন শক্তিগুলির বিপরীতধর্মী প্রবণতার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজের রূপ নিত্য বদলাচ্ছে। মধ্যবিত্ত সমাজ এই রূপান্তরের মুখে তার ভাবনার শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার আর সম্প্রসারণের অবকাশ নেই। স্থবিরত্ব এবং জরা তাকে আক্রমণ করেছে বলে মনে হয়। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে সৃজনীশক্তির অগ্রতুলতা এবং রাজনীতি আর সমাজসেবার ক্ষেত্রে উৎকট দলাদলি স্থবিরত্বের একটি প্রমাণ। সমাজের কোথাও নূতন প্রাণচাঞ্চল্যের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে না এমন কথা বলব না তবে সে প্রাণের বেগ আসছে সম্পূর্ণ নূতন দিক থেকে। নূতন কালের নূতন মানুষের হৃদয় নবীন প্রাণশক্তিতে স্পন্দমান—মধ্যবিত্ত সমাজের ধ্যানধারণার সঙ্গে এই নূতন গতিচাঞ্চল্যের নাড়ীর যোগ নেই। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ শুধু বয়স হয়েছে বলেই যে বুড়িয়ে গেছে তাই নয়, নূতন ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের অসামর্থ্যের জন্যও তার ভিতর কালাতিক্রমণ-দোষ প্রকাশ পেয়েছে। মধ্যবিত্তের পুরাতন বিশ্বাস এখনকার কালের পক্ষে নিতান্ত বেমানান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মানবত্বের মর্যাদা বলতে মধ্যবিত্তেরা শুধু স্বশ্রেণীর ব্যক্তিত্ব আর মানবত্বকেই বুঝতেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর মানবত্বের ধারণায় ইতিমধ্যেই গভীর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে যে গণমানবত্ব, এখনকার কালের সুস্পষ্ট পক্ষপাত তারই উপর।

৩

বাংলার সমাজদেহে আর একটি যে গুরুতর পরিবর্তন সাম্প্রতিক কালের পরিধির ভিতর সাধিত হয়েছে তা হচ্ছে যৌথ পরিবারপ্রথায় ভাঙন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবারপ্রথার উদ্ভব। সমাজ পরিবারের সমষ্টিমাত্র। সুতরাং সমাজতত্ত্বের আলোচনায় পারিবারিক বিন্যাসের রূপান্তর বিশেষ মনোযোগ দাবী করতে পারে। পরিবার-প্রথার রূপান্তরের মূলে রয়েছে তিনটি প্রভাব—অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, নগরমুখী মনোভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষা। নগরমুখী মনোভাব আর পাশ্চাত্য শিক্ষাকে একই বস্তুর এ-পিঠ ও-পিঠ বলা যেতে পারে। যখন থেকে আমাদের সমাজে মধ্য আর নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের উদ্ভব হয়েছে তখন থেকে যৌথ পরিবারপ্রথায়ও ফাটল দেখা দিয়েছে। যৌথ পরিবার শহরের সীমার ভিতর নেই তা নয়, তবে তার মূলটি বিধৃত রয়েছে গ্রামীণ জীবনের কাঠামোর ভিতর। ভূসম্পত্তির প্রাচুর্য আর বিত্তের সচ্ছলতা থেকেই পল্লীর একান্নবর্তী পরিবারপ্রথার পরিপুষ্টি। শহরের পরিধির মধ্যে যেখানে যেখানে আমরা যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের সাক্ষাৎ পাই, খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে

এই বিশেষ ব্যবস্থার যোগ আছে। তবে অর্থনীতির মার বড় সাংঘাতিক মার। দেশে অর্থনৈতিক অনৈশ্চিত্য যত বাড়ছে তত একান্নবর্তী পরিবারের সংখ্যা সংকুচিত হয়ে আসছে। একান্নবর্তী পরিবারের স্থলে দেখা দিচ্ছে খণ্ড পরিবার, টুকরো টুকরো পরিবার, স্বামী-স্ত্রী সমেত গড়পরতা চার কি পাঁচটি গোষ্ঠ সংখ্যায় যার আয়তন সীমাবদ্ধ। এই খণ্ড পরিবারগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও স্বয়ং-নির্ভর, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। শহরে যে অগণিত ফ্ল্যাট-বাড়ী রয়েছে সেই কবুতরের খোপের মত বাসগৃহগুলি এই সব খণ্ড পরিবারের আশ্রয়। ফ্ল্যাটের আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবারগুলির ধ্যানধারণারও ব্যাপ্তি কিংবা সংকোচন ঘটছে। আর যেখানে বর্তমানকালীন প্রভাব অতিক্রম করে পুরাতন একান্নবর্তী পরিবারের রূপ শহরের সীমার মধ্যে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে সেখানেও অবস্থার সবিশেষ পরিবর্তন হয়েছে দেখতে পাই। একান্নবর্তী পরিবারের পূর্বতন সৌষ্ঠব আর নেই। পরিবারের কর্তার অপ্রতিহত কর্তৃত্ব বহুল পরিমাণে লুপ্ত হয়েছে, ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্কের মালিন্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যৌথ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্পৃহাকে আর চেপে রাখা যাচ্ছে না, পরিবারের বয়স্ক মানুষদের হাতে যে রকম আয় ও সম্পত্তি তার দ্বারাই প্রধানতঃ তাঁদের মর্যাদা নিরূপিত হচ্ছে, বয়সের এবং সম্পর্কের বড়-ছোট এ ক্ষেত্রে সামান্যই প্রভাব বিস্তার করছে, এমন-কি স্নেহ ও বাৎসল্যকাতর এমন-যে বৃদ্ধ পিতামাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁরাও ওই অবান্তর প্রভাবের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে নন, এইটে লক্ষ্য করবার বিষয়। অর্থনৈতিক ভাঙনের মুখে একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা বেশীকাল টিকতে পারে না, এই হচ্ছে সাধারণ অভিজ্ঞতা। বিশেষ, বাংলা দেশের বর্তমান ক্রান্তিকালীন অবস্থার মধ্যে যৌথ পরিবার-জীবনের আর বলতে গেলে কোনরূপ ভবিষ্যৎই নেই। গত পনেরো বছরের ভিতর বাংলা দেশ বহুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত একটার পর একটা দুর্বিপাক বাঙালীর জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে, বাঙালীর পুরাতন পারিবারিক প্রথার কাঠামোটিকে তছনছ করে দিয়েছে। যুদ্ধ, নিম্নলীপ, জাপানী বিমানের হামলা, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, দেশবিভাগ—একটি দুর্বৈব গত হতে না হতেই আর একটির আগমন হয়েছে। যেন এতেও বাঙালীর সহিষ্ণুতার শক্তি যথেষ্ট পরীক্ষিত হয় নি, সর্বোপরি দেখা দিয়েছে উদ্বাস্তু সমস্যা। উদ্বাস্তু সমস্যা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বাজনে ক্রমফীত হয়ে সীমানায় এপার ওপার উভয় বঙ্গে গোটা সামাজিক কাঠামোটাকে ধরে সবেগে নাড়া দিয়েছে। উদ্বাস্তু সমস্যা যেহেতু মুখ্যতঃ বাস্তুরই সমস্যা সেই কারণে পারিবারিক প্রথার সঙ্গে এর যোগ গভীর। তাছাড়া পূর্বোক্ত কারণগুলি তো আছেই। এই সকল নানাবিধ প্রভাবের চাপে আমাদের চোখের সামনেই আমাদের সমাজের রূপ বদলাচ্ছে। যৌথ পরিবার-প্রথা ভাল কি মন্দ, যৌথ পরিবারের তুলনায় খণ্ড পরিবারের সুবিধা বেশী না অসুবিধা বেশী—এখানে সে সকল বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে লাভ নেই। বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, যৌথ পরিবার-প্রথায় ভাঙন ধরেছে এবং তা আমাদের চোখের উপরই বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে।

শহরের ফ্ল্যাট-নিবাসী খণ্ড পরিবারগুলি বিরাট নগরসমুদ্রে এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বিশেষ।

একের সঙ্গে অপরের যোগ নেই। এমন কি একই এলাকার দুই পরিবারের মধ্যে প্রতিবেশীর সম্পর্ক অনুপস্থিত। প্রতিবেশিপরায়ণতার এই অভাব নাগরিক মনোভাবের ফল, সে কথা পূর্বে বলেছি। তবে এদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্কই নেই এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। নগরের ফ্ল্যাটনিবাসী মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরের মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হন প্রতিবেশিত্বের ভিত্তিতে নয় বৃত্তির সমতার ভিত্তিতে, রুচির সমতার ভিত্তিতে। সমধর্মিতা ও সমমর্মিতা এঁদের মিলনের প্রধান যোগসূত্র। এটিও এক ধরনের সামাজিকতা। এ জাতীয় জিনিসকে প্রতিবেশিত্বের রকমফের বলা যেতে পারে।

তবে যে কথা পূর্বে বলেছি, ফ্ল্যাটবাসীই হোক আর অট্টালিকাবাসীই হোক নগরের অধিবাসীরা মনে প্রাণে এখনও নাগরিক হতে পারে নি। ভারতীয় মানসে বদ্ধমূল কৃষির সংস্কারই এজন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেকেরই মনোজীবনের উপর আঁচড় কাটলে দেখা যাবে, সকলেই ভিতর গ্রামীণ প্রভাব অনুলিপ্ত হয়ে আছে। বেশেভূষায় চলনেবলনে পুরোদস্তুর সাহেব, ভিতরে ভিতরে তাবিচ-কবচ-মাদুলিতে বিশ্বাস, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাবের কথা বলে পরক্ষণেই ওলাবিবি আর মা শেতলার থানে ছুটে যাওয়া—এতো নিত্যই দেখতে পাচ্ছি। আসলে ইউরোপীয় সভ্যতার খাত-বেয়ে-আসা শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে আমাদের কৃষি-মনোভাবের সামঞ্জস্য হয় নি। কৃষিব্যবস্থার উপর শিল্পোন্নয়নের পালিশ ঠিকমত লাগে নি। তাইতেই সর্বত্র দো-আঁশলা মানসিকতার আধিপত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৪

বাংলার সমাজ-বিবর্তনের আলোচনা করতে গিয়ে শিল্পসাহিত্যের কথা প্রসঙ্গত বলেছি। এ সম্বন্ধে আর দুচার কথা বলে বর্তমান আলোচনার উপসংহার করব। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে, সৃজনীশক্তির বন্ধ্যাত্ব বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে। আধুনিক লেখকগণ সমাজসচেতন হয়েও সৌনঃপৌনিকতার দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। তবে আশার লক্ষণ একেবারেই কোন দিকে কোনরকম নেই তাও ঠিক নয়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আট বছরের মধ্যে এক দিক দিয়ে একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পরিবর্তনটি উৎসাহব্যঞ্জক। সে হচ্ছে এই যে, বাংলার সংস্কৃতিকর্মীরা জাতির পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার ও নবমূল্যায়নের চেষ্টা করছেন। লুপ্তপ্রায় লোকশিল্পের ঐতিহ্যের ভিতর জাতির যে প্রাণ সঞ্জীবনী-শক্তির অভাবে ঝুকপুক করছিল তাকে নব বলে বলীয়ান করে তোলার বিধিবদ্ধ প্রয়াস চলছে। গত দুশো বছরে বাংলার শিল্প সংস্কৃতিতে নাগরিকতার উপর অত্যধিক ঝোঁক পড়েছিল। গোটা সংস্কৃতি-আন্দোলন পাশ্চাত্য শিক্ষার সুরে বাঁধা ছিল। এর দ্বারা আমরা নানা ভাবে লাভবান হলেও ক্ষতিও বড় কম হয় নি। শিল্প সাহিত্যের অতিরিক্ত পাশ্চাত্যমুখীনতার ফলে দেশের বৃহত্তর জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগ রক্ষিত হওয়ায় আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাবের ভিতর প্রচণ্ড একটি অভাববোধের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ সেই অভাববোধের পরিপূরণের চেষ্টা চলছে। চলছে যে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন তার অন্যতর প্রমাণ। আরও কতিপয় প্রতিষ্ঠান এ পথে অগ্রসর হয়েছেন। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের লক্ষ্য ও অভীপ্সার ভিতর যে নূতন গতিবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে এ সকল তৎপরতা তারই সূচনা।

অনেক অনেক দূরে

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

কথার অকেজো জাল বুনে বুনে কী বা লাভ বলো,
তার চেয়ে এ মাটির সীমানা পেরিয়ে যাই চলো—
অনেক অনেক দূরে সাতরঙা রামধনু দেশে,
যেখানে আমার মন তোমার সাগরে গিয়ে মেশে।

টুপটাপ পাতা-ঝরা, ঝিরি-ঝিরি ঘন ঝাউবন ;
মনিয়ার ঠোঁটে ঠোঁটে কেঁপে-ওঠা নীল নির্জন—
কথা-কলি স্বর্ণার, মণিপুরী আলাপের সুর,
সেখানে উঠুক বেজে তোমার এ সুমিত নূপুর।

সে আকাশে কেউ নেই এমন কি সাঁঝের তারাও
তবুও সেখানে আছে, তুমি আর আমাকে ছাড়াও ;
প্রথম পৃথিবী থেকে সত্তার অবিসর্গী প্রেম—
তাইত আর এক রূপে তোমাকেই আবার পেলেম ॥

তোমাকে দেখার পরে

কবিরুল ইসলাম

এখন কি মনে হয় জানো,
দূর যদি কাছে আসে কবেকার স্বপ্নের মতো
নয়নে অনেক নীল, আকাশে অনেক রঙ যদি
জমে জমে হয় ছুটি পাহাড়ি গীতল ঢেউ নদী
তারপর এক হয় সাগরের দেহে এসে হৃদয়ের গানও
তখন কি মনে হয় জানো ?

মনে হয়, তুমি যেন দূরতরো আকাশপ্রদীপ
কিছু চোখে দেখা আর বাকিটুকু স্বপ্নের সোনা
সূর্য্য সোহাগ স্নাত সংরাগে হরিৎ সে দীপ
মনে মনে যদি তুমি ছোট নীড় বোনো
তখন কি মনে হয় জানো ?

মনে হয়, তুমি এক দূরতরো আকাশের দ্বীপ,
তোমাকে যায়না পাওয়া শুধু স্থূল শরীরের শবে
যেমন আকাশ হয় পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে
(যে আকাশে তুমি এক আকাশপ্রদীপ)
সে মন তোমাকে পায় তবে।

জোনাকি-মন

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দিনের দীপ নিভিয়ে দিয়ে অন্ধরাত যখন ঢেউ তোলে
আকাশ ঘিরে, জোনাকি-মন আপনি নেভে আপনি ওঠে জ্বলে :
ভাবনা থেকে ভাবনা ছুঁয়ে স্বপ্ন থেকে স্বপ্নে ভেসে গিয়ে
জোনাকি-মন পাখনা মেলে অবাক-নীল অন্ধকার দিয়ে।

কাজ না-থাকা সে-অবসরে স্বপ্নময় আলোর ছোঁয়া লেগে,
ঘুম-নিবিড় ক্লান্তি মুছে চেতনা বুঝি অমনি ওঠে জেগে—
কতো কথার শিশির ঢালে মনের ঘন গহন ঘাসে ঘাসে,
কি অনুভূতি ছড়ায়, আমি কি করে বলি ; বলা যে যায় না সে !

জোনাকি-মন হারিয়ে যায় উতল ছুটি সবুজ পাখ্‌নায়,
ঝিঁঝিঁর স্বরে ঝুমুর-বাজা অন্ধকার বনের সীমানায়—
আকাশে-ভাসা মেঘের বুকে, তারার তীরে : দূরের পৃথিবীতে ;
কখনো বুঝি সে-অতীতের ব্যথা-মধুর স্মৃতির সমাধিতে !

ক্লান্তি-ভরা দিনের শেষে রাতের হাতে যখন কালো তুলি,
জোনাকি-মন কখন জ্বলে বুলিয়ে দেয় আলোর অঙ্গুলি :
ছ'চোখ ভরে স্বপ্ন ঝরে, ছন্দগুলি অন্ধকারে ভেসে,
প্রাণের নীল-নির্জনতা মুখরতায় মাতিয়ে তোলে এসে ॥

ইনাম

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

হিমাঙ্ক তাপ ওঠে আর নামে
এ জীবন খাপছাড়া
শেয়ার বাজারে দাম চড়ে আর কমে।

হায় অদৃষ্ট একি পরিহাস
মৃত্যু তো পথে করিয়াছে গ্রাস,
পটারীদোকানে যে ছেলের নাম
লটারীতে উঠিয়াছে।

অজানা শেয়ার, শেয়ার বাজারে
তুলে নেয় চড়া দাম,
ফুটপাথে-হাঁটা বোবা জীবনের
এই কি ঠিক্ ইনাম।

বিধান

মানসী দাশগুপ্ত

বৃষ্টির ছাটে তারানাথের ঘুম ভেঙে গেল। নওলের গায়ের চাদরটা ফের সরে গিয়েছে। মশারির গায়ে হাত রেখেছে একটা, নিশ্চয়ই মশায় খাচ্ছে। হাতড়ে হাতড়ে তারানাথ বেড সুইচটা টিপে আলো জ্বালালেন। নওলকে ঠিক করে শুইয়ে নিজের নরম মলিদাটা বিছিয়ে দিলেন তার গায়ে। কাঁথায় কি চাদরে কখনো গরম হয় এই বর্ষা বাদলের ঠাণ্ডায়? মশারি সাবধানে তুলে বাইরে এসে জানালা বন্ধ করতে গেলেন তারানাথ। উত্তরের ঘরে এখনো আলো জ্বলছে, তার পরিষ্কার আলোয় দেখা যাচ্ছে ঘরের চৌকাটে পা রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কেতকী। আদিত্য বুঝি তবে এখনো ফেরেনি!

বিছানায় নওল একটু নড়ল। তাড়াতাড়ি তুলে জানালা বন্ধ না করেই ফিরে এলেন তারানাথ: 'কি হয়েছে দাদুমনি?' ঘুমের ভিতরেই অভ্যাসবশে আধো আধো স্বরে ছেলেটি বললে, 'একটা বুড়োর গল্প বল।'

বাইরে দরজা নড়ছে, খোলারও শব্দ হলো। সদাশিব লোকটা ভাল। ঘুমোচ্ছে ত ঘুমোচ্ছেই, দরজা নাড়ো আর ভাঙো ওঠবার নাম নেই—ও রকম নয়। ঘরের কাছে এসেছে আদিত্য। ওদের স্বামী-স্ত্রীর গলা শোনা যাচ্ছে।

কেতকী বলছে: 'তোমার সঙ্গে ছুটো কথা ছিল।'

আদিত্যর উত্তর: 'বাপরে কি বৃষ্টি দেখেছ, এইটুকু আসতে ভিজে একেবারে—'

—'কথাটা জরুরী।'

—'ভিজে কাপড়টা ছাড়ি, সবুর করো।'

—'এতক্ষণ যদি ভিজে কাপড়ে থাকতে পেরে থাক, আর দুদণ্ড দাঁড়ালেও নিউমোনিয়া হবে না।'

—'সর্দিজ্বর হতে পারে। সে ভারি বিশ্রী। সরো, সরো।'

মাঝরাতে-ঘুমভাঙা-তারানাথের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। কথাটা জরুরী। সন্দেহ কি?

নাতনী! একটিমাত্র ছেলের ঘরে ঐ একটিমাত্র নাতনী! তাকে নিয়েই ত তারানাথ ভুলেছিলেন একে একে স্ত্রী পুত্র সব হারাবার দুঃখ। মা-মরা মেয়েটাকে বুকে করে মানুষ করতে কী না সয়েছেন। অফিসে দেরি হয়ে গেছে। বড় সাহেব গঞ্জনা দিয়েছে। ঘরে সময় পাননি পাঁচজন আত্মীয় কুটুমকে ডেকে আপ্যায়িত করতে, তারা গঞ্জনা দিয়েছে। তারা কী বুঝবে কেতকী তাঁর কী ছিল! কেতকীই কী বুঝেছিল?

সেদিনের কথা তারানাথের আজও মনে আছে। সারাদিন ধমধমানির পরে বিকেলের চায়ে বসে কেতকীই গুমোট ভেঙে কথা পাড়ল ফের। বলল, 'তাহলে আমি যাই দাদু, তোমার যখন এতই অনিচ্ছে।'

তারানাথের চা খাওয়া ভাল হয়ে গিয়েছিল। বললেন, 'আর ভেবে দেখা গেল না!'

কেতকী হেসে বলল, 'আজই সন্ধ্যায় যে রেজিষ্ট্রার আসবেন।'

নিজেকে সামলাতে তারানাথের বেগ পেতে হয়েছিল বইকি। তবু, শেষ অবধি শান্তভাবেই বলতে পেরেছিলেন, 'তাঁকে তবে এখানেই নিয়ে এস, আমিও সাক্ষী থাকি।'

—এ জন্য নিজেকে আজও ধন্যবাদ দেন তারানাথ। সেদিন কিন্তু বলেও মনে হয়েছিল—না বললেই হত। আর একটু সাধ্য সাধনা, আর একটু জোর! তার পরেও কী তারানাথ রায়ের নাতনী পারত ঐ বরকে বরণ করে নিতে?

কী পাত্র: কী তার মহিমা!! যার যাতে মজে মন! কালো, মাথায় তাঁর চেয়েও আধ হাত লম্বা, রোগা, কেমন রুক্ষ রুঢ় মুখ।। প্রথম থেকেই কোনদিনই তারানাথের ভাল লাগেনি আদিত্যকে। কিন্তু কী করবেন! নাতনী বড় হয়েছে, আর বিয়ে ত তারই। তিনি ত আর নতুন করে জীবন সুরু করছেন না। আচ্ছা না হয়, পুরুষ মানুষের আবার চেহারা কি, পৌরুষ থাকলেই হ'ল। পৌরুষ থাকলে কেউ দাদাশ্বশুরের ঘরে বসে ভাত খায় দিনের পর দিন? তখন তিনি সত্যি তাই চেয়েছিলেন। ওরা দৃষ্টির আড়ালে থাক, ভাল থাক। তারানাথ ত একাই—ওরা বাড়িতে থাকলেও, না থাকলেও।

আদিত্য বলেছিল হেসে, 'এক তো বড়লোকের নাতনীকে বিয়ে করেই ভুল করেছি। তার ওপর তাকে তার দাদুর স্বর্গ-রাজ্য থেকে আমার কাঁচা ঘরে টেনে নিয়ে ফেলে ভালবাসাকে একরম মাটি করে ফেলতে চাই না। কি বলেন দাদু, আমার এই খিওরিটা আপনার ভাল লাগছে না?'

তারানাথকে ক্ষীণ হাসতে হয়েছিল: 'তোমার খিওরি নিয়ে এ বয়সে আমি আর কী-ই বা করব। ও বুঝি আর না বুঝি, যে কারণেই হোক—তোমরা এ বাড়িতে থাকবে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর আমার কী আছে?'

কেতকীর বর—তাকেও বানিয়ে বানিয়ে রসিকতা করে শোনাতে হবে! হরগৌরী মিলন হল না যে! ভুলতে যেন পারছিলেন না তারানাথ। ভুলিয়ে দিল, নওল এসে ভুলিয়ে দিল। কেতকী-আদিত্যের কথায়, চলনে, ওদের ভিতরকার প্রভেদ তখনও এত বেশি রকম স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তখনও ওরা হাসলে সে হাসি মেকি হয়ে বাজত না। সেদিনই কি কম বেজেছিল তারানাথের? থাকবি আমার এখানে, চোখের ওপরে, অথচ করবি বা নিজেদের মতলব, তাই? চিরকাল বিবেক ডাক্তারের ওপর তাঁর ভরসা। প্রাচীন লোক। এই কেতকীর বাপের জন্মের সময় এক পাড়ায় ছিল বলে—কলেজের ছোকরা, সবে ডাক্তারী ধরেছে, কী উপকারটাই করেছিল। সে কালে ছিল নাকি এত ডাক্তার বদ্যি তড়িঘড়ি ডেকে আনা! দেশী দাই—তাও আগের দুবার কাঁচা

গেছে বলে একটি পাশ করা ধাত্রী, বাস। ভাগ্যে বিবেক ছিল ধারে পাশে। তারপর থেকে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব যার পরিবারে যখনই এই বিপদ, তারানাথ ডেকে পাঠিয়েছেন ওই ডাক্তারকে, পরামর্শ দিয়েছেন: 'ওকে ডাক।' অথচ তাঁর নিজের ঘরে—একটি মাত্র নাতনী—কিছুতেই আদিত্য তাঁর কথা কানে নিল না! ঘাড়ে করে নিয়ে গেল কোথাকার কোন হাসপাতালে! যা! তোদের কর্মফল তোরাই ভুগবি। এই যে তারপর এক বছর ধরে মেয়েটা নানান রকমে ভুগলো, তাঙলো তো তোদেরই মন শরীরের সঙ্গে সঙ্গে? নওল কাছ ঘেঁষে এসে তারানাথের চামড়া ঝুলে পড়া গলার ওপরে ছোট একখানি হাত রেখে অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করল: 'কিসের শব্দ?' এটা জিজ্ঞাসা নয়, ভয়। জানানো হল যে আমি জেগে আছি আর ভয় পেয়েছি। নাঃ, এ ছেলেটাও আজ একদম জেগে গেছে। হবে না, যে গুমোট দিয়েছে। বৃষ্টি ধরেছে কি গুমোট, গুমোট ছাড়ল কি অমনি আবার—

'বিস্কুট খাবি দুখানা?'

বিস্কুটের টিনের সন্ধানে উঠতে হয় তারানাথকে, ওদিকের আলো নিভে গেছে। জরুরী কথা বলা হল কিনা কে জানে। তারানাথের জরুরী কথাটাই কেউ শুনতে চায় না। সেটা হল, তারানাথ এখন মরলেই বাঁচেন।

নওল ডাকে, 'দাদু, বিছানা ভয় পাবে।'

'না, বিছানা ভয় পাবে না। তুমি ভয় পেও না, যাচ্ছি আমি বিস্কুট নিয়ে।'

সকাল হলে নওলকে নিয়ে তারানাথ বেড়াতে চলে গেলেন। যক্ষ, রক্ষ, সিংহ, শৃগাল, গন্ধর্বলোকে সকলের সঙ্গে বিহার করে এই দুই শিশু যখন বাড়ি ফিরে এলো বড়রা তখনও বাড়িতেই। আদিত্য ঘরের সামনে বারান্দায় হেলান দেওয়া বেতের চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে। কেতকী বাইরের ঘরে বসে বসে অকারণে পুরোনো একটা বেডকভার মেরামত করছে ছুঁচ এবং বিচিত্র বর্ণের সুতো দিয়ে।

নওল ডাকল, 'মা—আ।'

কেতকী একবার তাকিয়েই আবার কাজে মন দিল, সাড়া দিল না। তারানাথ তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে নিয়ে গেলেন তাকে। রাস্তায় শোনা গল্পের হিসাবমত এক থোলো আঙুর স্কুলে থাকার কথা, সত্যি রয়েছে কি? সেটা দেখা দরকার। নওল দাদুর সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে যেতে বারবার মা-র দিকে তাকালো। কেতকীর সূচীকর্মে অখণ্ড মনোযোগ!

বারান্দা দিয়ে পার হয়ে যাবার পথে আদিত্য কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে বললে, 'বেড়িয়ে এলেন দাদু?—কদুর ঘুরে এলি রে খোকা?'

খোকা যতক্ষণ তার দুর্বোধ্য আধস্বরে তার ভ্রমণের ভাঙা ভাঙা বর্ণনা দিতে ব্যস্ত তারানাথ আড়চোখে দেখে নিলেন আদিত্যকে। রাত্রে ওদের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে সন্দেহ নেই। এক-রাত্রে-শুকিয়ে-যাওয়া আদিত্যের মুখ দেখে এতদিন পরে যেন হঠাৎ তারানাথের মায়া হল। বললেন: 'দাদুমণি, খেলবে নাকি এখন বাপের সঙ্গে?'

আদিত্য বিব্রত এবং ব্যস্ত হয়ে বললো, 'না না। আমায় আবার এক্ষুনি বেরোতে হবে দাদু, সমস্ত ব্যবস্থা ট্যাবস্থা—'

নওলের হাত ধরে তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে চলে এলেন তারানাথ। ব্যবস্থা ট্যাবস্থা তিসের এ জানবার আগ্রহ বা সাহস কিছুই তাঁর নেই।

সেদিন দুপুরে আদিত্য খেতে এল না। তার পরের দিনও না, তার পরের দিনও নয়। রাত্রের খবর অবশ্য তারানাথ টেবিলে বসে নেন না, কিন্তু টের পেয়েছেন সন্ধে রাত্তির আটটা নটার ভিতরেই, কেতকীও বাড়ী এসে ঢুকল, সদাশিবও তালা দিল কল্যাণিবল গেটে। ঘুমন্ত নওলের কাছে আর একটু সরে গিয়ে শোন তারানাথ। নিশ্চিন্ত বিশ্রামে ঘুমিয়ে পড়েছে নওল। অতি ছোটবেলা থেকে ওর তারানাথের কাছে শোওয়া অভ্যাস।

সেদিন খেতে বসে তারানাথ আর পারলেন না। কেতকীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আদি থাচ্ছে কোথায় ?' কেতকী মাছের কাঁটা বাছছিল। প্রথমে সাড়া দিল না। তারপর মাছের বাছা অংশটুকু নওলের মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'বাস, এবার তোমার হয়ে গেছে, যাও। আর বসে থাকে না। মানিকের মা, ওকে একটু আঁচিয়ে দাও তো।"

তারানাথ বললেন, 'ছোটদের তোমরা যত বোকা ভাব অত বোকা ওরা নয়। ওরাও বোঝে। আদি আছে কোথায় ?"

কেতকী বলল, 'মেলে টেসে হবে, কী করে বলব দাদু ?'

—'কি করে বলব আবার কি ? স্বামীর খবর তুমি স্ত্রী হয়ে জান না ?'

কেতকী বলল, 'স্ত্রী ছিলাম যখন তখন জানতাম।'

'সব সময়ে মান-অভিমানকেই বড় করা ভাল ?'

'মান আবার কি দাদু ? কুড়িয়ে কাড়িয়ে কি মান হয় ? আমরা ত আলাদা হয়ে গেছি।' এ হল আইনের কথা।' কিন্তু না, যেন কাঁচের চুড়িটা ভেঙে গেছে। কি হয়েছে ? বাঃ তার পরেও রুই মাছের মাথাটা যত্ন করে খেতে দোষ কি ? কপিটা ত ভালই রেঁধেছে সিউপরণ! নওল ? নওলকে ওর পিসী নিয়ে যাবে, ওর বাবারও তাই ইচ্ছে। কেতকী মত দিয়েছে। আইনমতে সব হয়, ঠিকই তো! বাইরে কে যেন ডাকছে কেতকীকে। বোধ হয়, সেই বকাবার ছোকরা। বাকে নিয়ে প্রথম গোলমাল জোর হয়ে উঠলো ওদের। কেতকীর কথা শুনতে পান তারানাথ।

'কে, কল্যাণ ? তুমি বুঝি জান না আমাদের খবর ? ও! অনেকদিন! হ্যাঁ। চলো চলো। আমার ঘরে চলো। সদাশিব, বাইরে কেউ গাড়ি নিয়ে এসে আমার খোঁজ করলে তাকে বাইরেই অপেক্ষা করতে বলে আমায় খবর দিও। এস কল্যাণ।"

এই পথ দিয়েই যাবে ওরা ওঘরে। নিজের সংকোচেই সরে এলেন তারানাথ। ঘরের মেঝের সতরঞ্চির ওপরে বসে আপনার মনে খেলা করছে নওল, নওল—তাঁর ছোট্ট খেলার সাথী। তারানাথের কিছু বলবার নেই, আইন যে! কেতকী আদিত্য, তারা হল বাপ মা।

শখ হয়েছিল—ওকে এনেছিল পৃথিবীতে, শখ মিটে গেছে, বিলিয়ে দিতে চায়। তারানাথ কে ?

—'দাদু স্পিরিংয়ের মাছটা পোকা খায় না ? কই খাচ্ছেনা তো !"

চোখটা মুছতে গেলেই নওলের চোখে পড়ে যাবে। অবাক হবে ও, অবাক! পৃথিবীতে আরও কত অপ্রিয় বিস্ময় ওর জন্যে জমা আছে!

কেতকী এসে দাঁড়িয়েছিল ছেলের পাশে। তারানাথ বললেন, 'এক কাজ কর না দিদি। ওকে আমায় দিয়ে দাও না, কথাটা ত একই। তোমাদের দায় না থাকলেই হল।'

কেতকী ম্লান হাসল : 'তা হয় না দাদু।'

হয় না।

বিকেলে এসে কারা নিয়ে গেল নওলকে। তারানাথ সারাদিন দরজায় খিল তুলে বসেছিলেন নওলকে নিয়ে। দরজায় ধাক্কা পড়তে তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে দোর খুলে বাইরে বের করে দিয়েই ফের বন্ধ করে দিয়েছিলেন দরজা। বাইরে গিয়ে কি খুশি হয়েছিল নওল ? হওয়ারই কথা। সারাদিন ঘরে বন্ধ থাকতে কি ছোট ছেলের ভাল লাগে! তারপরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন তারানাথ জোরে ধাক্কা শোনার আশায়। হয়ত—হয়ত মিটে গেছে গোলমাল। হয়ত আবার এসেছে ও !!

ধাক্কা পড়লো অনেক রাত্রে। খুলে দিতে পেয়ালা হাতে ঢুকলো কেতকী। বয়স্ক ক্লান্ত মুখ। কোথায়, কোথায় কাটিয়েছে সারাদিন কে জানে!

—'ওভালটিনটা অন্ততঃ খেয়ে নাও দাদু।'

কথা না বাড়িয়ে পেয়ালা হাতে নিলেন তারানাথ।

—'অমন দোর দিয়ে বসে আছ কেন দাদু ? আমি ত আছি।'

তুমি আছ! ঠিকই, না থাকলে হত না !!

এক চুমুকে পেয়ালা খালি করে শুয়ে পড়লেন তারানাথ। চোখ বুজে বললেন : 'মা'।

অনেকদিন পরে ছেলেবেলার মত মায়ের কোলে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে তাঁর। সাধ হয়েছে মাথায় মুখে তাঁর স্নেহস্পর্শ পেতে। সে মা কোথায় ? সে মা তো নেই।

সাবেকী কথা

অসিতকুমার হালদার

আমাদের সময়কার শিল্পকলায় জাতীয় উত্থানের যে সহজ আন্দোলন চলেছিল তা কোনো একটি প্রাদেশিক প্রাচীন রীতিকে অবলম্বন করে দাঁড়ায়নি। বাঙলা গ্রাম্যকলা পট অনুকরণে Bengal School-এর প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়নি। এখন বিলাতি ক্রিটিকের কেতাবের পরিভাষা Primitive, timeless unsophisticated folk art বলে আমাদের ক্রিটিকরা যে বক্তৃতা দিচ্ছেন আমাদের আমলে তার বালাই ছিলনা। তাছাড়া তখন উৎপাতে futurist cubist impressionist আর্ট হলেও Picasso'র মত surrealist আর্ট তখনো গজিয়ে ওঠেনি। আবার হয়ত কিছুদিন পরে প্রগতিশীল বিলাতি সঙ্গীতে দেখব নবতরভাবে গাধার ডাক নিয়ে গানে সুর দেওয়া হচ্ছে আর সাততাড়াতাড়ি আমাদের দেশের তানসেনের দল তাই দেখাদেখি নিজেদের রাগরাগিণীর সপিণ্ডিকরণ করছে এই এ্যাটমবোমার যুগে।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরা সারাভারতের শিল্পকৃষ্টির ধারাকে মেনে নিয়ে নিজেদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁদের চিত্রকলায়। তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন ২০০০ বৎসরের শিল্পধারার মধ্যে একতা যা ক্রমে ভিক্টোরিয়ার যুগে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম বিলাতি আর্ট দেখে। যেমন রঙিন খেলা দেখে শিশুরা ভোলে। তাই তাঁরা বম্বে, বেঙ্গল, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রাদেশিক বিভাগ বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আছে তার কোনোই ধার ধারেননি। অথচ দেখা গেছে নন্দলালের বেলায় তাঁর কলায় পৌরাণিক ভাব (classical) বেশ ফুটে উঠেছিল। ক্ষিতিনের জন্মগত বৈষ্ণব সংস্কারে পুষ্ট মন অন্তিনব রূপ পেয়েছে নানা প্রকার বৈষ্ণবী পরিকল্পনায়। শৈলেন রাজপুত শৈলীতে আকৃষ্ট তা তাঁর মেঘদূতের চিত্রাবলী, জগাই মাধাই, রাজা নহুষ প্রভৃতি চিত্রে দেখতে পাই। আর আমার ছবিতে কবি রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, নিবেদিতা, Cousins সবাই পান শিরিকের ধারা। কাব্য, সঙ্গীত, নাট্য, ভাস্কর্য ও সাহিত্য রচনায় পুষ্ট হওয়ায় হয়ত এইকথা সকলে বলেন। আমি শৈশব থেকে বরাবর মন থেকে ছবি আঁকি এবং নানা প্রকারের বিষয় নিয়ে, রকমারিভাবে এঁকে থাকি এই কথাই বলব কেবল। আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বড় সাইজের ছবি আঁকার পথ আমিই দেখাই রাম ও গুহক মিলন ছবি এঁকে। আমাদের ছবিতে বরং অজন্তা মোগল বা রাজপুত চিত্রকলার আস্বাদ পেতে পারা যায় কিন্তু পিকাসো মেটেসি বা ইটালীর চিত্রকরদের ছবির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না।

সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রযুগের নবীন সুবর্ণ সংস্কার চলছে। ভাবায়, ভাবে, নব নব বিষয় নিয়ে কাব্য রচনার পথ তিনি খুলে দিয়েছেন। Nobel prize তখনও কবি পাননি। রবীন্দ্রভক্তদের

প্রতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তখন বিরক্ত। মহাকবির পঞ্চাশ বৎসরের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অভিনন্দনে এক জায়গায় ছিল :

জগৎ কবি সভায় মোরা
তোমারি করি গর্ব
বাঙালী আজি গানের রাজা
বাঙালি নহে খর্ব

জগৎ কবি সভায় (তখনো Nobel prize না পাওয়ায়) রবীন্দ্রনাথকে বসানোতে কী রাগ! কাগজে কাগজে এই নিয়ে তুমুল আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের চক্রে তখন মুষ্টিমেয় লোক ছিলেন। তাঁরা সবাই বেনীর ভাগ মণিলাল গাঙ্গুলির প্রতিষ্ঠিত কাস্থিক প্রেসে এসে জড় হতেন। সেই চক্রে আমারও ছিল গতিবিধি। সেখানে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী, হেমেন্দ্রলাল রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সুসাহিত্যিক ও কবি আসতেন। শান্তিনিকেতন থেকে অজিত চক্রবর্তী কবি রবীন্দ্রনাথের নতুন নতুন গীতধারা আমাদের কাছে হারমোনিয়ম সংযোগে গাইতেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নতুন নতুন কবিতা পাঠ শোনা হ'ত চা খাবার সঙ্গে সঙ্গে। নানাপ্রকার সাহিত্য, ইতিহাস এবং দার্শনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা, সঙ্গীত ফলার প্রভৃতি চলত সেখানে সন্ধ্যাকালে প্রায় প্রত্যহই। এই আড্ডার মধ্যেই আমাদের পরস্পর নানা বিষয় জ্ঞান ও শিক্ষার আদান প্রদান হত—তার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। সেটা আমাদের একটি জীবন্ত সমাজ ছিল। সুরেশ বন্দ্যো সরস ভাষায় তাঁর জাপান প্রবাসের গল্প কখন কখন শোনাতেন আমাদের। একদিন বিউগল বাদন সুরে একটি চার লাইনের গান সুরেশ আমাদের আড্ডায় শোনালেন। সত্যেন তার ব্যাখ্যা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটি কাগজে লিখলেন :

অতি বড় হাবাতে আমি গো একটা
আমি আবার খুঁজে পেলেম মণিব্যাগটা
চাঁদের আলোতে দেখি
আরে ছ্যাঃ এ কি—
ট্রামগাড়ী চাপা পড়া ব্যাঙ চাপটা।

আমরা সকলে মিলে টেবিল চাপড়ে সেই বিউগল বাদন সুরে গাইতে লেগে গেলাম। এইভাবে হৈ চৈ করেও কাটত কখনো কখনো আমাদের। আমাদের এই আড্ডায় অমল হোম, ক্ষিরোদ রায় এবং শচীন সেনকে আমি নিয়ে যাই। ক্ষিরোদ পরে চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়েছিলেন। অমল journalism নিয়ে আছেন এবং শচীন দশ বৎসর London Meteorological Observatary তে কাজ করে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। এখানে Diretor General of Meteorology'র পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। সত্যেন দত্তকে আমার রাজা প্রফুল্লকুমারের বাগানবাড়ীর জন্য আঁকা দুটি বড় বড় পদ্মের ছবি দেখিয়েছিলাম। রাঁচি থেকে তাঁকে লিখেছিলাম

নামকরণ করে দিতে। তিনি তার উত্তরে ৪৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট থেকে ১৪ই আগষ্ট ১৯১৬ সালে আমাকে লিখেছিলেন :

বন্ধু,—
আমি বলি হাঁচি। স্বাস্থ্য সুখের চাঁচি॥
রোগ-বালাইয়ের নাক কাটবার কাঁচি॥
শীতে সেথা হয়না হাঁচি। গ্রীষ্মেতে ঘামাচি;
সেথাও হবে জ্বর? এ যে ভয়ঙ্কর!
কেমন আছ এখন? সেটা জানাও বন্ধুবর!
দেখচি এখন কলকেতাতে আমরা ভালই আছি
যদিও হেথা রাতে মশা দিনের বেলায় মাছি॥

তোমার ছবির নাম। নীচেতে লিখলাম॥
(এক) বোধনের বাঁশী। (দুই) ঘুমন্তের হাসি॥
এখন তবে আসি বন্ধু, এখন তবে আসি॥
রং-মহলের রঙ্গী তুমি, পাঁচ পীরের এক পীর
বহুৎ সেলাম জানায় তোমায় কবি কলমীর॥

(alias) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কলকাতায় সে সময় একটি বিরাট সাহিত্য বৈঠকের অধিবেশন হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'স্বাগত' কবিতাটি তখন পাঠ করেছিলেন। তাতে কলিকাতা নগরীর গুণকীর্তন করতে গিয়ে শিল্পকলার নবীন পূজারীদের বিষয় বলেন :

একদা যে দীপ জ্বালিল যামান
সে দীপ আজি এ নগরী জ্বালে
পঞ্চপ্রদীপ, অবনী গগন, অসিত, মুকুল নন্দলালে।

আমি সত্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সুরেন গাঙ্গুলীর মত ধুরন্ধর শিল্পীর নাম উল্লেখ না করে মুকুলের নাম কেন দিলেন? উত্তরে তিনি হেসে আমায় বলেছিলেন, "ছন্দের মুখে ওর নামটা বেরিয়ে গেছে আর তাকে সবাই কি করে।" আমাকেও সেই সাহিত্য সম্মিলনীতে একটি শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়েছিল। প্রবাসীতে সেই প্রবন্ধ পরে প্রকাশিত হয়েছে।

বাল্যকালে আমার আর এক জায়গায় গতিবিধি ছিল—আনাগারিক ধর্মপালার বাড়ীতে। তিনি আমাকে বুদ্ধের জীবন ও বাণীর বিষয় বহু কথা গল্পের ছলে বলতেন। মনে এক রঙীন চিত্র উদয় হত বুদ্ধের বিষয়। সাঁওনাথে বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের চিত্র তাঁর জন্য আমি এঁকেছিলাম। সেটি রবিদাদারও খুব পছন্দ হয়েছিল কেননা তাতে ইটালিয়ান ছবির ধিয়েটারি ঢংএর pose

ছিল না। অথচ আমি তখনো অবনমামার কাছে যেতুম না বা অজন্তার বিষয় কিছুই জানতুম না। তিনি বুদ্ধের একটি গল্প বলেছিলেন তার প্রধান মর্মকথা ছিল 'ভাল কথা বলে যাবে—লোকে শুনুন বা না শুনুন।' তখন বুদ্ধের বয়স ৬০ পেরিয়েছে, রণক্লান্ত যোদ্ধার মত দেশে দেশে পদব্রজে প্রচার করে দেশনা দিয়ে শরীর জীর্ণ গলক্ষত উপস্থিত। আনন্দ তাঁকে বল্লেন "প্রভু, আপনি সারাজীবন দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কেহই ত তা গ্রহণ করচে না, তবে কেন আপনি শরীরকে কষ্ট দিচ্ছেন?" বুদ্ধ তখন শান্তভাবে উত্তর দিয়ে বল্লেন "দেখ আনন্দ শীতকাল আসে প্রতিবৎসরেই কিন্তু কারু গায়ে শীত লাগে, কারু গায়ে লাগে না—তবুও তো শীত আসে? তেমনি আমি এসেছি, বলে যাব, কেউ গ্রহণ করবে, কেউ করবে না।" আজও সেই কথাটি আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে। বহুকাল পরে যখন আমি লক্ষ্ণৌ আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ, মাননীয় আনাগারীকা ধর্মপালা আমাকে স্মরণ করেছিলেন এবং আমাকে দিয়ে তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত মূলগন্ধকুটি বিহারের দেয়ালে বুদ্ধজীবনী নিয়ে ছবি আঁকাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কোনো বক্ষ্যমান কারণে তা আমার ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি—সেটা আঁকলেন পরে একজন জাপানী শিল্পী অজন্তার ছবির অনুসরণ করে। আজ এই শেষ বয়েসে যে আমি বুদ্ধের জীবনী নিয়ে ৬৫০ পৃষ্ঠা সাবলীল মুক্তকছন্দে ধৈর্য সহকারে লিখতে পেরেছি তার গোড়ায় আছে পূজনীয় ধর্মপালা এবং রবিদাদার পূর্বেকার উৎসাহ। রবিদাদাও বুদ্ধের জীবনী নিয়ে অনেক কথা কখন কখন আমাদের (তাঁর নাতি-নাতনীদের) বলতেন। সৌম্যের বোধহয় সেকথা এখনও স্মরণ আছে—যদিও তখন তিনি আমাদের চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন।

অজ্ঞাত

অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

হাতেই ছিল চিঠিটা। চিঠির কোণে লেখা রাস্তার নামের সঙ্গে গলির মুখে দেওয়ালে লটকানো ষ্ট্রীট নেম-প্লেটটার অক্ষরগুলি আরও একবার মিলিয়ে নিলাম। আশেপাশের বাড়িগুলির নম্বর দেখতে দেখতে এগোতে থাকি। এই গলিটি ধর্মতলা ষ্ট্রীট থেকেই বেরিয়েছে। বাড়িগুলির তলায় মুসলমানদের বেকারির দোকান। মনে হোল এই পল্লীর বাসিন্দারা পাঁচমিশেলি। তবে, সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ্যাংলোইণ্ডিয়ান পরিবারই বেশি।

সপিল পলিপথটা ধরে এগোতেই থাকি। আশপাশের বাড়িগুলির নম্বর বেশ এলোমেলো। একবার মনে হোল, পথচারীদের কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেব নাকি। তার প্রয়োজন হোল না। সঠিক নম্বরটি পেয়ে গেলাম। ফ্ল্যাট বাসা নিশ্চয়ই। কারণ, চিঠির ঠিকানায় রুম নম্বর দেওয়া রয়েছে। অতএব সাহস করে সিঁড়িপথটাই ধরলাম। ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি, আর এক চিলতে দৃষ্টি পড়ে চারপাশের ঘরগুলিতে। কোথাও কোন উদ্ভিন্না যুবতী অ্যাপ্রণ পরে কৌকড়ানো ছাঁটা চুলের কেয়ারিতে ব্যস্ত। কিন্তু এমনই সাজপোষাক যে দেখে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলাম। কোথাও এই সবেমাত্র স্নান সেরে বিগতযৌবনা টাওয়েল জড়িয়ে একেবারে সামনে এসে পড়লেন। সিঁড়ির চাতালে সব নোংরা জামাকাপড় পরা ছেলেমেয়ের দল খেলা করছে। দেওয়ালে লেগে অজস্র রকমের বিশ্রি দাগ। থাপে থাপে জমে ডিমের খোলা, ভাঙা বোতল, পাউরুটির টুকরো আরও অনেক কিছু নোংরা যা কল্পনাতীত। প্রথমেই কেমন জানি মনটা একেবারে বিষিয়ে গেল। বুঝলাম, এবাড়ির বাসিন্দাদের জীবিকা খুব গৌরবজনক নয়।

অবশেষে বিরক্ত মনে, নাকে রুমাল চেপে, সঠিক ঘরের সামনে এসে পড়লাম। রুমাল দিয়ে মুখটা একবার বাড়িয়ে মুছে নিয়ে দরজায় ধীরে ধীরে টোকা দিলাম। দশ থেকে পনেরো সেকেণ্ড অতিবাহিত না হতেই দরজা খুলে দাঁড়ালেন এক যুবতী। পরণে নীল রঙের স্কার্ট। স্বল্প পোষাক বেশ বিব্রত করে তোলে। সোনালী চুল। নীল চোখ। প্রথমে বিস্ময় মাখানো ছিল দৃষ্টিতে, শেষে সরু হাসি দেখা দিল রক্তিম ঠোঁটে। বললেন, 'তুমিই তো ডাটের বন্ধু?'

আমিও স্বল্প হেসে অবশ্যই ইংরাজীতে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আমারই নাম এলেন পার্কার।'

আমি বললাম, 'বুঝেছি।'

হেসে বললো পার্কার, 'প্রথমে আমার একটু অবাকই লেগেছিল তোমাকে দেখে। কারণ

যন্ত্রণার ঘোরে তার দেওয়া তোমার নাম আর ঠিকানাটা আমি নির্ভুল ভাবি নি। তার জন্যে কিছু মনে কোরনা যেন।'

বললাম, 'না, এতে মনে করার আর কি আছে। তবে, ডাট আমাকেই হঠাৎ স্মরণ করলো কেন, বুঝতে পারছি না।'

'কেন, তুমি কি ডাটের বন্ধু নও?'

'ওর বন্ধু কেউ আছে বলে জানি না আর আমি কোনদিনও ডাটের বন্ধু হয়ে উঠতে পারি নি। কেবল ক্লাশমেট।'

'তুমি বিনয় করছো।' পার্কার হাসলো। 'তোমার বন্ধুর খুব অসুখ। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার স্ত্রীকে কোনও খবর দেবো কিনা। ডাট রাজী হোল না। কিন্তু আমি একাও বেশী ভরসা পাই না। শেষে ও তোমারই নামঠিকানা দিলো। তাই, তোমায় চিঠি দিলাম। ভাবিনি, তুমি আসবে।'

'কেন?'

'ডাটের সঙ্গে তো কাউকেই এখানে কোনদিন দেখা করতে আসতে দেখিনি।'

'এখানে কি তোমার ডাট তা হোলে অনেকদিন ধরেই আছে।'

'তা আছে। কিন্তু এখন অতো কথা বলার সময় নেই। তুমি তোমার বন্ধুর বিছানার সামনে এই চেয়ারটায় বোস একটু, আমি এক্ষুণি গির্জা থেকে ঘুরে আসছি। জানো তো আজ স্যাবাথ ডে। তবে, তোমার বন্ধুকে পাওয়ার আগে অবশ্য কোনদিনও গির্জায় যাই নি।' কথা বলার সঙ্গে পার্কার ম্লান হাসলো।

আমিও থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তবে আজকে গির্জায় যাচ্ছো কেন?'

'তোমার বন্ধুর নিরাময় প্রার্থনা করার জন্য।' এবারে হাসি ছিল না পার্কারের। কেবল নীলচোখদুটো আমার মুখ থেকে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিলো মাটির দিকে। পাশের জানালা থেকে সিল্কের একটা স্কার্ফ টেনে নিলো পার্কার। সেই স্কার্ফটায় মাথা থেকে কান ঢাকা দিয়ে গলার কাছে বেঁধে নিয়ে হেসে বললো, 'তুমি তা হোলে একটু বসছো তো?'

'কিন্তু ও যদি এখুনি জেগে উঠে কিছু চায়?'

'কিছু চাইবে না এখন। সকালেই ডাক্তার ওকে মরফিন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, তুমি তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু।'

পার্কার হেসে ঘাড় নেড়ে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এতক্ষণে ঘরটি ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম। সারা দেওয়ালটা নানা রঙের লতাপাতা আঁকা কাগজে মোড়া। স্থানে স্থানে ওয়াল পেপারটা ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়া অংশ দিয়ে দেখা যায় পুরোনো নোনা ধরা দেওয়াল। আসবাবের মধ্যে একটা কাঁচের আলমারি। তার ওপরের থাকে সাজানো নানা ঢঙের পুতুল। তার নীচের থাকে জামা কাপড়। আর একটি টেবিল, তার দুধারে দুটি চেয়ার। দেওয়ালে আঁটা সব কটি ছবিই প্রমথেশের আঁকা। আর সব ছবি কটিই

পাকারের ষ্টাডি। ছবিগুলো সব পাকারের গুড্ ষ্টাডি। পাকারের স্বচ্ছ নীল পোষাকই আমায় বেশ বিব্রত করে তুলেছিল, এখন এই গুড্ ষ্টাডিগুলো আরও একরাশ লজ্জা এনে দিলো। হয়তো, ওই ছবিগুলো অন্য কোন মেয়ের হলে বেশ সহজ চোখেই উপলব্ধি করতাম, কিন্তু যেহেতু পাকারের তাই বার বার মনে হোল, প্রমথেশের অধিকারের মধ্যে বুঝি আমিও একজন দাবিদার এসে পড়লাম। সে বাসনা আমার নেই। তাই দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে ভুল করি নে।

ঘরটিতে যেন কেমন এক অন্ধকারময় আচ্ছন্নতা জড়িয়ে রয়েছে। এই ঘরেই লোহার একটি মাত্র খাট। পাশাপাশি মাথার দুটি বালিশ। তার একটিতে শুয়ে আমার ক্লাসমেট প্রমথেশ দত্ত। যাকে কোন দিনও বুঝে উঠতে পারি নি, যে আমার বুদ্ধির বাইরে, অথচ হৃদয়ের এক্তিয়ারে, সেই প্রমথেশ রোগ-পাণ্ডুর শরীরে মৃতের মত ঘুমে অচৈতন্য। সাদা ধবধবে ওর গায়ের রং। বলিষ্ঠ, দীপ্ত ওর চেহারায় আজ যেন মৃত্যুর ছায়া নেমেছে। নিদ্রাতুর চোখ দুটির তলায় ঘন কাজল কে-যেন লেপে দিয়েছে। ওর এই আজকের চেহারার দিকে দেখে, কেন জানি না আমার চোখের পাতা ভরে উঠলো জলে।

এই প্রমথেশকে আমি শৈশব থেকেই চিনি। কিন্তু কোনদিন ওর মনকে আমি বুঝতে পারি নি। এক সঙ্গে স্কুলে পড়তাম। পাশাপাশি দুজনে বসতাম। ওই পর্যন্তই। ওর মনের নাগাল কোনদিনও পাইনি। চিরকালই প্রমথেশ ছিল একটু উদ্ভট রকমের। বাইরে থেকে সবাই ওকে বলতো ভারি রুক্ষ প্রকৃতির। কিছুটা বুঝি গোঁয়ারও। সবাই যখন যে পথে চলতো, অন্ততঃ যে পথে চলা একান্তই স্বাভাবিক, সে পথে ও কখনও চলতো না। ইচ্ছা ক'রে না, ওটাই ছিল ওর স্বভাব। সবাই যখন পরীক্ষার আগের দিনগুলোতে পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত, প্রমথেশ তখন ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেলে, ও পরীক্ষা দিতে ঢুকতো। আর পরীক্ষা শেষ হওয়ার অনেক আগেই, সর্বপ্রথম প্রমথেশই উত্তরপত্র জমা দিয়ে চলে যেতো। অথচ, ফল হোত ভালই। সকলেই বলতো, একটু মন দিয়ে পড়লে প্রমথেশ নিশ্চয়ই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হতে পারবে।

কিন্তু ঠিক তখনই ও এক উদ্ভট কাজ করে ফেললো। যে বয়েসে ছেলেরা কেবল মেয়েদের চারপাশে থৈ থৈ করে ছড়িয়ে থাকতেই ভালবাসে, আর নীতিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে, ও সেই বয়সেই প্রেম করে বসলো। এবং আমার বেশ স্পষ্টই মনে আছে সেই রাতটির কথা। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ঠিক আগের দিন। উপু হয়ে তক্তপোষে বসে লণ্ঠনের আলোয় ঝুলে ঝুলে হেরিকের "টু ডাফোডিল্‌স্" কবিতাটির বঙ্গ সংক্ষেপে মুখস্থ করছি, এমন সময় জানালা থেকে ডাক দিলো প্রমথেশ।

মুখ তুলে তাকিয়ে বললাম, 'কিরে, ব্যাপার কি ?'

'এখুনি একবার বাইরে আয়।'

'কেন ?'

'আয় না।'

আয় না বললেই তো আর আমি যেতে পারি না। মা মরা ছেলে বটে আমি। কিন্তু তখনও ঠাকুমা জীবিত। বৃদ্ধার দৃষ্টি এড়ানো বেশ কঠিন। তবু প্রমথেশের আহ্বান উপেক্ষা করতে করতে পারি না। কোনরকমে লুকিয়ে তো বাইরে বেরিয়ে এলাম, কিন্তু ফুটপাতে নেমেই চঞ্চুস্থির। ফুটপাতের ধারে পলাশ ফুলের গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সাধনা। যার প্রেমে তখন প্রমথেশ হাবুডুবু খাচ্ছে।

সাধনাকে একটা হাত তুলে নমস্কার করতেও ভুলে গেলাম। সাধনাকে ডেকে, প্রমথেশ আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল আমাদের পাড়ার কালীমন্দিরের সামনে। রাত তখন অনেক। মন্দির বন্ধ।

সেই বন্ধ মন্দিরের সামনেই থেমে পড়লো প্রমথেশ।

আমার হাত ছেড়ে, সাধনার হাত ধরে বললো, 'ওই ঠাকুর আর তোকে সাক্ষী রেখে আমি এখনই সাধনাকে বিয়ে করলাম।'

তখন লুকিয়ে লুকিয়ে সবে 'শেষপ্রশ্ন' শেষ করেছি। হেসে বললাম, 'তবে এ শৈব বিবাহ।'

প্রমথেশ বললো, 'না। শৈববিবাহ নয়। কালকেই আমরা বম্বে চলে যাচ্ছি। সেখানেই আমাদের রেজেষ্ট্রী ম্যারেজ হবে। সেটা ফরম্যালিটি। এইটি আসল বিয়ে। তাছাড়া সাধনাকে নিয়ে যাওয়ার আগে একজন মানুষকেও সাক্ষী রেখে গেলাম।'

আমি স্তম্ভিত।

ওরা দুজনে তখন মন্দিরের দরজায় ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করছে। সাধনা শেষে প্রমথেশকেও করলো। শেষে তারা হাত জড়াজড়ি করে আমার সঙ্গ নিলো।

আমি বললাম, 'রেজেষ্ট্রি ম্যারেজ তো হতে পারে না। তোমাদের বয়স অল্প।'

প্রমথেশ হেসেই অস্থির। বললো, 'আরে সেইজন্যেই তো বম্বে যাচ্ছি। বয়স ভাঁড়াবো। আর তাছাড়া ধর্মমতেও তো এই একটা বিয়ে হয়ে গেল।

প্রমথেশের কথায় আর আমার উত্তর জোগালো না। বললাম, 'তা না হয় হোল কিন্তু তুমি কালকে পরীক্ষাও দেবে না ?'

সে বললো, 'ম্যাট্রিক পাশ করে আর কি হবে বল্ ? জগতের বড় বড় কজন শিল্পী, আর সাহিত্যিক পরীক্ষায় পাশ করেছে ?'

আমি বললাম, 'তা বলে পরীক্ষায় পাশ না করলেই সবাই শিল্পী, সাহিত্যিক হয়ে ওঠে না।'

রাস্তার মধ্যেই থেমে পড়লো প্রমথেশ। প্রায় চিৎকার করেই বলে ওঠে। 'তুই-ও আমার প্রতিভায় বিশ্বাস করিস না ? আমি বড় আর্টিষ্ট হতে পারবো না ?'

আমি চিরকালই দুর্বল। মাথা নেড়ে বার বার বললাম, 'তা তুমি প্রতিভার অধিকারী। তুমি বড় শিল্পী হতে পারবে।'

যেন স্বস্তি পেলো প্রমথেশ। আবার সাধনার হাত জড়িয়ে ধরে আমার সঙ্গে এগিয়ে চললো। শেষে বললো প্রমথেশ, 'তুই কি হবি ঠিক করেছিস ?'

'পাশ করতে পারলে, কেরানী হব ভাই।'

'তোর কোন ভাই এ্যাম্বিশন নেই।'

তা নেই। তাই, এক সময় বাড়ির দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললাম, 'আজকের রাতটা তবে কোথায় থাকবি শুনি?'

'ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে। ওখানেই আজ আমাদের বাসর হবে।'

ওরা দুজনে চলে গেল। আর আমি বিস্মিত, হতবাক মন নিয়ে পড়ার ঘরে আবার ফিরলাম বস্তুসংক্ষেপ মুখস্থ করতে। সে বারে পরীক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফেল করলাম। সমানে গুরুজনদের বকুনি খেয়েছি আর মনে মনে গাল পেড়েছি প্রমথেশকে। কারণ, পরীক্ষার হলে, একটুও কিছু লিখতে পারিনি। সর্বক্ষণ মনে পড়েছে কেবল প্রমথেশ আর সাধনাকে। কিন্তু এমন মানুষ প্রমথেশ যে বোম্বাই পৌঁছে একটা চিঠিও দিল না কোনদিন। তবু, পরে যখনই পাড়ার কালীমন্দিরের পাশ দিয়ে যেতাম, মনে মনে বলতাম, 'ঠাকুর তুমি ওদের ভাল রেখো। সুখী করো।'

এরপর থেকে প্রমথেশ সাধনার আর কোন খবরও পাইনি। বছরের পর বছর সমানে পাশ করে গেছি। কারণ তখন প্রমথেশ ছিল না। সেই আমার আম্বিশন অনুযায়ী কেরানী হয়ে বিবাহ করে চারপাঁচটি ছেলেমেয়ের পিতা হয়ে, চতুরাশ্রমের বাণপ্রস্থ অধ্যায় নিয়ে বেশ গভীরভাবে যখন পড়াশুনো করছি, তখন একদিন বাড়ির সামনে এসে থামলো কালো রঙের চাউস এক মোটর গাড়ী।

গাড়ি থেকে নেমে সেদিন আমার সামনে যে এসে দাঁড়ালো, সে তখন আমার ক্লাসফ্রেণ্ড প্রমথেশ নয়, ভারতবিখ্যাত শিল্পী মিঃ পি, ডাট্। পোষাকেই কেবল পরিবর্তন হয়েছিল, মনে নয়। এসেই গাড়ী থেকে নামতে না নামতেই বলে বসলো, 'চল আমার সঙ্গে।'

'আহা, না হয় একটু বোসই না দরিদ্র ক্লাসমেটের বাড়িতে।'

'আমার এখন বসার সময় নেই। তুই আমার সঙ্গে এক্ষুণি চল। আর বাড়িতে বলে যা ফিরতে রাত হবে।'

আমি জানি, যতই মনে মনে ওর আপত্তি তুলি না কেন, প্রমথেশ ডাক দিলে আমায় সাড়া দিতেই হবে। প্রমথেশের সঙ্গে বেরিয়েও এলাম বাড়ি থেকে। তার গাড়ীতে উঠতে যাবো, চক্ষু স্থির। গাড়ি ভর্ত্তি সুটকেশ, বেডিং, ওটা-ওটা। বললাম, 'আবার চললে কোন দেশে?'

প্রমথেশ বললো, 'চললাম না, ফিরলাম তোদের দেশে।'

'তার মানে, ফিরলে তো বুঝলাম, কিন্তু এ গাড়ি কার? সাধনাই বা কোথায়?'

'এ গাড়ি সাধনারই। সাধনা কলকাতাতেই তো আছে অনেকদিন। শুনলাম, দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যে অদ্বিতীয় সাধনা দত্ত চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছেন।'

ছবি আমি কোনকালে দেখিনা। দেখলে হয়তো এতবড় খবরটা অনেকদিন আগেই পেতাম। তবু মাঝে-মধ্যে যে সাধনা নাম্নী কোন সুন্দরী নৃত্যপটিয়সীর নাম শুনিনি, তাও নয়। তবে কোন দিনই ভাবিনি, সে সাধনা আর কেউ নয় আমাদের প্রমথেশের স্ত্রী।

তাই অপ্রতিভ কণ্ঠেই বললাম, 'তুমি চিরকালই আমার কাছে হেঁয়ালি ছিলে প্রমথেশ। আজও তোমায় বুঝতে পারলাম না।'

প্রমথেশ হাসলো খানিক। বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলো, 'মনে পড়ে সেই রাতের কথা।'

বললাম, 'পড়ে না আবার। ওই তো, ওই টুকুই তো আমার রোজনামচা।'

প্রমথেশ বললো, 'তার পরের দিনই বোম্বে রওনা হয়ে গেলাম। হাতে কিছু টাকাপয়সা ছিল, তাই কিছুদিন কোন অসুবিধাই হয় নি। আইন মতে বিয়েও হয়ে গেল যথাবিহিত। কৈশোরের দাম্পত্য-প্রণয়ে ভরে গেল দিনরাতগুলো। কিন্তু তেমন দিন কোন মানুষেরই বেশিদিন থাকে না। পড়লাম, দারুণ অর্থসংকটে। কি করি আর কি না-করি, এই ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলাম। মাঝে মাঝে মনে হোত, জীবনে কি খুব মস্ত বড় একটা ভুল করে বসলাম। কিন্তু এজাতীয় কোন প্রশ্নকেই জীবনে আমি প্রশ্রয় দিই নি। খুঁজে নিলাম এক কারখানার চাকরি। হোটেল থেকে নেমে এলাম বস্তীতে। দিনে অথবা রাতে ডিউটি পড়তো কারখানায়। বাকি সময়টুকুতে ছবি আঁকতাম। লাইব্রেরিতে গিয়ে বিভিন্ন শিল্পীর ছবি দেখতাম। প্রথম প্রথম সাধনা সেই বস্তি-ঘরেই তার সংসার গড়ে নিলো। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তার মধ্যে অসন্তোষ জমা হতে লাগলো। দিবারাত্র এটা নেই, ওটা নেই, বলে বলে আমায় পাগল করে তুললো। তার নাকি জীবনে ধিক্কার এসেছে, সে এখন এক কুলির বউ। আমি তাকে বার বার বলতাম যে আমি কুলিই হোই, আর যাই হোই না কেন, আমাকেই তো সে ভালবেসেছিল। আসলে কি জানিস?'

আমি বললাম, 'কি?'

প্রমথেশ বাইরে থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বললো, 'সে আমায় ভালবাসেনি কোন দিনও। সাধনা ভালবেসেছিল এক বিখ্যাত শিল্পীকে, আর তার বিভবী পরিবার হওয়ার ইচ্ছাটিকে।'

আমি বললাম, 'তাতো সাধনা আজ হোয়েছে। সেতো আজ বিখ্যাত শিল্পীরই পরিবার।'

প্রমথেশ হাসলো। বললো, 'তা হোয়েছে সে আজ ঠিকই। কিন্তু অনেক ঘুরপথে। দিনদিন সাধনার আক্ষেপ আর আক্রোশ বেড়ে যেতেই লাগলো। আমি শেষে ভাবলাম, এক কাজ করা যাক, সাধনাকেও এক শিল্পকাজে ঢুকিয়ে দেওয়া যাক। তা হোলেই ও ভাল করে বুঝতে পারবে, শিল্পকাজে প্রবেশ করা এক কথা, আর ছয়-দৈত্যের মধ্য দিয়ে শিল্পী হওয়া অন্যকথা। দিলাম সাধনাকে ভর্তি করে স্থানীয় ডান্স সেণ্টারে। সাধনা খুসিতে ঝলমল করে উঠলো। ওর সুন্দর সুঠাম দেহের বন্দনাকারী জুটলো অনেক। ভক্তের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই যেতে লাগলো। সুবিধা হোল আমারই একরকম। আমি নিরবচ্ছিন্ন অবসর পেতাম ছবি আঁকার।'

প্রমথেশ মুহূর্তের জন্য থামতেই আমি বললাম, 'একে তুমি সুবিধা হিসাবে গ্রহণ করলে?'

প্রমথেশ হাসলো, 'করলাম। সত্যি, সাধনার মধ্যে প্রতিভাও ছিল বুঝি। সাধনা বোম্বের ওদের সেন্টার থেকে স্কলারশিপ নিয়ে চলে যেতে চাইলো মাদ্রাজে। আমি বাধা দিলাম না। কেবল চাইলাম আমিও ওর সঙ্গে যেতে। কিন্তু ও আমাকে সঙ্গে নিলে না।

থাকতে না পেরে আমি বলে উঠে, 'কেন?'

প্রমথেশ এখানেও হাসলো, আরও খানিকক্ষণ। বললো, 'সাধনা ভয়ানক আপত্তি করলে ওর সঙ্গে আমার যেতে চাওয়ায়। বললো, আমার ছবি আঁকাতে যেমন অখণ্ড অবসর আর নির্জনতার প্রয়োজন, তেমনি ওরও শিল্পসাধনায় ওই একই জিনিষের প্রয়োজন। আমি বললাম, তা হোলে আমাদের সংসার। সাধনা উত্তর দিয়েছিলো, শিল্পীর কোন সংসার নেই। মাদ্রাজে সাধনা নাম করলো খুব। উপার্জনও করতে লাগলো প্রচুর। আমাকে টাকা পাঠাতেও লাগলো। আমি কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণ মেতে রইলাম আমার শিল্পকাজে। শুনলাম, সাধনা তার দলবল নিয়ে বেরিয়েছে সারা ভারত ভ্রমণে। প্রতি বড় শহরে ওরা থামবে। দেখাবে ওদের নাচ। কুড়িয়ে আনবে অজস্র অর্থ। আরও শুনলাম সাধনার সম্বন্ধে অনেক কিছু। কিন্তু কান দিই নি।'

আমি রক্ষণশীল চিরকালই। তাই এই অধ্যায়ে প্রমথেশকে থামিয়ে এবিষয়ে নানাকথা বেশ করে শুনিয়ে দিলাম। প্রমথেশ শুনে আরও হেসে বললো, 'কবিরে পাবে না খুঁজে তার জীবনচরিতে।'

'সে কি এই অর্থে?'

প্রমথেশ জবাব দেওয়ার সুযোগ পায় নি। সাধনার গাড়ী থেমে পড়েছিলো তার বাড়ির সেট পেরিয়ে অন্দরমহলের দরজার সামনে। প্রমথেশ আর আমি দুজনেই নেমে পড়লাম। প্রমথেশ যেন কাকে তার ডাগর চোখদুটো দিয়ে খুঁজলো কিন্তু দেখতে পেলো না। ষ্টেশনেও খুঁজেছিল প্রমথেশ। সেখানেও পায় নি। এখানেও নয়। হয়তো, মনে হোল তখন আমার, প্রমথেশ তার বাকি জীবনেও আর তাকে খুঁজে পাবে না।

আমার ভাবনার পথ ধরেই বুঝি প্রমথেশও হাঁটছিলো। বললো, 'তা কেন হতে যাবে? এই তো তার গাড়ি আমায় ষ্টেশন থেকে নিয়ে এলো, তার বাড়ি আমায় আশ্রয় দিলো। আগামী কাল প্রেসকোটোগ্রাফাররা তার স্বামী বলে আমার ছবিও ছাপিয়ে দেবে অনেক। এর চাইতে বেশি কোন স্বামী তার স্ত্রীর কাছে আশা করতে পারে!'

আমি কোন জবাব দিই নি তখন। প্রমথেশের ওই হঠাৎ চিৎকার করে বলে ওঠায় কেমন যেন সেই ছোটবেলাকার মতো প্রমথেশের সম্বন্ধে ভয়-ভয় ভাবটুকু ফিরে এলো।

হঠাৎ প্রমথেশ করিডোরে দাঁড়িয়েই এক বেয়ারাকে আদেশ দিলো ট্যাক্সি নিয়ে আসতে একটা। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্যাক্সিও এসে পড়লো। কোন কথা না শুনে, নিজেই তুলে নিলো ট্যাক্সিতে তার মালপত্তর। তারপর নিজে উঠে বসে, আমাকে বসিয়ে দিলো জোর করে তার পাশে।

অন্য কেউ হোলে, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে প্রমথেশের এই কাণ্ড দেখে বলে উঠতো, উন্মাদ। কিন্তু আমি প্রমথেশকে যতোটুকু চিনি, তাতে অবাক হোলাম না। কেবল বললাম, 'চলেছো কোথায়?'

'একটা কোন হোটেলে।' সে জবাব দিলো।

'তাতো বুঝলাম। কোলকাতাতে এসেছিলেই বা কেন?'

'সাধনার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া কোরতে।'

'এই ভাবে, দুজনে দুদিকে থেকে কোনদিনও কি সেই বোঝাপড়া হবে?' প্রমথেশ জবাব দিলো না। কোনদিনও সে অন্য কারুর কথা শোনে নি। আজও শুনলো না। দুজনে নীরবে পাশাপাশি বসে রইলাম ট্যাক্সিতে।

শেষে একসময় প্রমথেশই বললো আপন মনে আবৃত্তি করার মতো করে, 'জানিস তুই, আজও আমি সাধনাকে সেই প্রথম দিনটির মতোই ভালবাসি। আজও আমি সাধনাকে ছাড়া অন্য কোন নারীর কথা ভাবতেও পারি না।'

একথার জবাব নেই। জবাবও দিলাম না কোন। কেবল বসে বসে ভাবতে লাগলাম, প্রমথেশের মনে এখন কি নিয়ে তোলপাড় চলছে? জীবন সম্বন্ধে ধিক্কার? আক্ষেপ? না, জীবনকে আজও প্রমথেশ ভালবাসে। এইখানেই প্রমথেশ বয়সের ধাপ পেরিয়ে চললেও, অজস্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠলেও, চিরকাল একই থেকে গেছে। জীবনকে সে চিরকালই ভালবেসে এসেছে। এমন কোন কাজ সে করতে পারে না, যা এই মূল্যবান জীবনকে নষ্ট করে। আত্মহত্যা? না, আত্মহত্যা প্রমথেশের মতো শিল্পীর নয়। সে তো কেবল শিল্পীই নয়, সে যে সৈনিকও।

নির্দেশ মতো ট্যাক্সি থেমে গেলো শহরের এক অভিজাত হোটেলের সামনে। প্রমথেশ তার সুন্দর ইংরাজী উচ্চারণে বুঝিয়ে দিলো তার কি রকম ধরের প্রয়োজন। লিফটে মালপত্তর নিয়ে এসে উপস্থিত হোলাম প্রমথেশের নতুন বাসায়। কিন্তু ঘরে জিনিষপত্তর রাখতে না রাখতেই প্রমথেশ হঠাৎ দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলে উঠলো, 'তা হোলে আজকে তুই এখন যা।'

আমি প্রমথেশের এই ব্যবহারে সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মন বড় ভারি হয়ে উঠলো। তবু শেষে হেসে ফেললাম। চিরকালই প্রমথেশ আকস্মিকতায় ভরা। আদব-কায়দার ধারে কাছে ঘেঁসে না। লিফটে না নেমে, সিঁড়ি ধরে নামতে নামতেই ভাবলাম, তুমি হয়তো যার মনের নাগাল খুঁজছো, তার মনের নাগাল পাবে না। কিন্তু এমনি আমারই মতো কতো মন যে তোমার জন্যে চিরকাল অপেক্ষা করে ফিরে গেলো, শিল্প, সে খবরও তুমি কোনদিন রাখলে না।

এরপরে কি জানি কেন, হয়তো ইচ্ছা করেই, প্রমথেশের সঙ্গে দেখা করলাম না। তবু আমি জানতাম ভাল করেই, যেদিন যখনই আমার কথা তার মনে হবে, আমার সঙ্গে ওর প্রয়োজন হবে, সেদিন পূর্বের ব্যবহারের কথা না মনে রেখে ছুটে আসবে। এলোও।

অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যায় বিশ্রাম করছি, প্রমথেশ এসে উপস্থিত। সেই এক কথা, এখুনি

চল। আমি জানি আমাকে যেতেও হবে। ট্যাক্সিতে তার পাশে বসে বললাম, 'কিন্তু চলেছি কোথায় ?'

'নিউ এম্পায়ারে। সাধনার আজ সেখানে নাচ আছে।'

মনে হোল প্রমথেশ কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন। মনে হোল একবার জিজ্ঞাসা করি, সাধনার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি-না। সাধনা কি বলে ? প্রমথেশ কি এখনও সেই হোটেলে আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলাম না। আর জানি ভাল করেই, ও নিজে না বললে হাজার জিজ্ঞাসা করেও কোন লাভ নেই। জবাব মিলবে না কোন।

প্রমথেশই বললো, 'জানিস, এতোদিন পরে সাধনাকে আজ সশরীরে দেখবো। ও যেসব ছবিতে অভিনয় কোরেছে সেসব ছবি অবশ্য দেখেছি। তবে সে তো ছায়া।'

হাসলো খানিক প্রমথেশ।

আমি বললাম, 'সাধনা তোমার সঙ্গে দেখা করে নি ?'

'না।'

আর কি বলবো ভেবে পেলাম না। চুপ করেই রইলাম।

প্রমথেশ আগে থেকেই টিকিট কিনে রেখেছিলো। দুজনে হলে যখন নিজেদের আসনে গিয়ে বসলাম, তখন নাচ সুরু হয়ে গেছে। অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম সাধনাকে। কী দেহবল্লরী! কী অপূর্ব নৃত্যাভঙ্গিমা। মঞ্চের আলোতে-ছায়াতে সংগীতের বাজনায় সাধনা ভরত-নাট্যমের যে-ছন্দ, যে-রূপ মূর্ত করে তুললো, তা কখনও জীবনে দেখেছি বলে মনে পড়লো না। নিজের উপস্থিতিটুকুও ভুলে গেলাম। প্রমথেশ একসময় কানেকানে বললো, 'সত্যই সাধনা সুন্দর, নয় ?'

আমি বললাম, 'অপূর্ব।' কিন্তু বললাম কাকে ? প্রমথেশ যে আমার পাশ থেকে উঠে যাচ্ছে। কি করবো ভেবে পেলাম না। প্রমথেশের সঙ্গই নিলাম। ব্যালকনি পেরিয়ে, লবি পেরিয়ে, প্রমথেশ চললো ষ্টেজের প্রবেশপথের দিকে।

প্রমথেশ তার স্বামীত্বের পরিচয় দিয়ে মঞ্চের অন্ধকার চলনটুকুতে অপেক্ষা করতে লাগলো। আমিও তার পিছনে দাঁড়িয়ে। পর্দা পড়ে গেল বুঝি। মঞ্চের ভিতরে আলো জ্বলে উঠলো।

সাধনা চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু না দেখে চলে যাওয়ার মত বুঝি প্রমথেশের চেহারা নয়। এমন কি অচেনা মানুষও পারে না। সাধনাও তার ঘর্মাক্ত দেহ নিয়ে সামনে এসে উপস্থিত। 'তুমি, এতদিনে·····'

'নেশা করেছো ?' প্রমথেশ জিজ্ঞাসা করে।

সাধনা হাসলো। শরীরে আড়মোরা ভেঙে বলে উঠলো, 'শরীরটা আজ বড় খারাপ। তাই···'

বলা নেই, কওয়া নেই, প্রমথেশ হঠাৎ সাধনার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো গ্রীণরুমে। সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো প্রমথেশ।

আশেপাশের সকলেই বিস্মিত। আমিও কম নই। বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। মনে হোল, ঘরে ঢুকবো কি ? সাহস হোল না। প্রমথেশকে জানি তো। বুকের মধ্যে সেই ছেলেবেলাকার ভয়টা, প্রমথেশের সম্বন্ধে, আবার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো।

চলে এলাম। একেবারে পথে। মনে মনে ভাবলাম, স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমানে বাইরের কারুর স্থান নেই। কিন্তু মনে মনে এও ভাবলাম, প্রমথেশ সাধনাকে রাগের মাথায় হত্যা করে বসবে নাতো ? থমকে দাঁড়ালাম পথে কিছুক্ষণ। কিন্তু তারপরেই মনে পড়ে গেলো অডিটরিয়ামে বলা প্রমথেশের কথা কটি। 'সত্যই সাধনা সুন্দর নয় ?' আর ভয় নেই। শত অপরাধ সত্ত্বেও সাধনা আজও প্রমথেশের দৃষ্টিতে সুন্দর। সুন্দরকে প্রমথেশ নষ্ট করতে পারে না কোন মতেই। শিল্পী সে। তার ধর্মই ওই। সুন্দরের রক্ষক তো শিল্পীমাত্রেই। কিন্তু ওই যে, মুহূর্তের দেখা হওয়ায় শুনলাম নেশা করার কথাটুকু। তাতেও তো ভয় নেই কোন। কারণ, সেদিনও প্রমথেশ বলেছে, 'কবিরে পারে না বুঁজে তার জীবন চরিতে'। কিন্তু একথার অর্থ তো কোনমতেই স্বেচ্ছাচারিতা নয়। তবু এটুকু বুঝলাম, আজকে এখুনি কোন কিছু ভয় করার নেই। অগণিত দর্শক আবার দেখতে পাবে নৃত্যপটিয়সীর নৃত্য। কিন্তু প্রমথেশ কি তাতেই সন্তুষ্ট চিত্তে চলে যাবে ? সে তো কেবল দর্শকই নয়, স্বামীও। আর সব চাইতে বড় কথা, সে আজও সাধনাকে ভালবাসে।

এর পরে প্রমথেশ আমার কাছে আসেও নি অনেকদিন। পথেঘাটে, ট্রামেবাসে অবশ্য দেখতাম পোস্টারে সাধনার ছবি। মনে মনে ভাবতাম, ওদের দুজনায় আবার গড়ে উঠলো কি মিলনের সেতু। গ্রীণরুমের বাইরে থেকে সেদিন শুনতে পাই নি প্রমথেশের কণ্ঠস্বর। প্রেমিক-প্রেমিকারা যখন কথা বলে না, তখনকার সময়টুকু নিশ্চয়ই ভয়ের নয়, ভালবাসার। তাই ভাবতে সুখ পেতাম, ওদের মিলন হোয়েছে। প্রমথেশের জীবনে আমারও আর কোন প্রয়োজন নেই। এইখানে আমি কিছু দুঃখ পেতাম। কিন্তু শিল্পী প্রমথেশকে আমি ভালবাসি; তাই, ভুলে যেতাম আমাকে অস্বীকার করার, আমার বন্ধুকে কেবল ক্লাশমেটের সম্বন্ধে আবদ্ধ করে রাখার দুঃখকে।

শেষে অনেকদিন, অনেক মাস পরে খবর পেলাম প্রমথেশের আমার বুক পকেটে রাখা চিঠিটিতে। লিখেছে পার্কার। সে এখনও ফিরলো না তো। জানা হয় নি তো এখনও প্রমথেশের কি অসুখ। প্রমথেশের জীবনে পার্কার এলোই বা কি করে ? এমন তো হয় না। হওয়ার কথাও নয়। তবে কি প্রমথেশ সাধনাকে ভুলেছে ? সে আর সাধনাকে ভালবাসে না ? প্রমথেশই তো একদিন বলেছিলো, সাধনাকে ভালবাসে বলে, সে অন্য কোন নারীর কথা ভুলেও ভাবে নি কখনও।

এমনি সব হাজার প্রশ্ন নিয়ে বসে রইলাম প্রমথেশের সামনে। তার অসুখে পাণ্ডুর, ম্লান শরীরটা এখনও ঘুমে অচৈতন্য। তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে এই অন্ধকার ঘরটা যেন কেমন

ভারি হয়ে উঠছে। সমানে একভাবে আর বসে থাকতে পারি না; উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে যাবো, এসে উপস্থিত পার্কার।

টেবিলের ওপর কতকগুলি ঠোঁঙা রাখতে রাখতে বলে উঠলো, 'তোমায় অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম তো!'

উত্তর দিলাম না কোন। হাসলাম।

'আমার একটু দেরি হয়ে গেলো, আমাদের তুজনার লাঞ্চ কিনে আনতে গিয়ে।' মাথায় জড়ানো স্কার্ফটা খুলে রেখে সে বলে উঠলো কথাকটি।

'আমি এখানে খাবো না তো।' বলে উঠলাম।

ম্লান হয়ে গেলো হঠাৎ পার্কার। 'ও ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কি ভুলে গিয়েছিলে তুমি?'

'আমার নিজের পরিচয়ের কথা।'

তাড়াতাড়ি আমি বলে উঠলাম, 'তাই যদি বলো আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে খাবো।' আর তাছাড়া প্রমথেশ যাকে সম্মান দিয়েছে, সে কি বড় নয়?'

পার্কার আবার হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। টেবিলে ঠোঁঙা থেকে খাবারগুলি সাজিয়ে আমরা তু'জনে মুখোমুখি বসলাম। আহার্য মুখে তোলার সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি বাড়িতে রাঁধো না?'

'আমাদের আর বাড়ির রান্না খাওয়া হয়ে ওঠে কই।'

এরপরে কি জিজ্ঞাসা করবো ভাবছি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার ডাটের অসুখটা কি?'

'অত্যধিক ড্রিঙ্ক করার জন্য পাকস্থলীতে জল জমেছে।'

চমকে উঠলাম শুনে। যে প্রমথেশ একদিন সাধনা ছাড়া অন্য কোন নারীর কথা চিন্তাও করতে পারতো না, সে আজ পার্কারের আশ্রিত। কেবল তাই নয়, সারা জীবন ধরে যে পানীয়টিকে সে অপরিসীম ঘৃণা করতো তাই আজ তাকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এনে উপস্থিত করেছে! কিন্তু প্রমথেশ এমন ভাবে আত্মহত্যা করলো কেন? আর যাই হোক, সে যে সাধনাকে আজ চিনতে পেরেছে, তাতে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না।

কিন্তু আমার মনে যে কৌতূহলটি অমতিবিক্রমে বেড়েই চলেছে, পার্কারকে দেখার পর থেকে যা আমাকে ক্রমান্বয়ে আশ্চর্যান্বিত করে তুলেছে, সেই কথাটি শোভন ভাবে শেষে পার্কারকে জিজ্ঞাসা করি। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পার্কারও বলে চলে। প্রমথেশ শহরের অভিজাত যে হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই হোটেলের ব্যালে ট্রুপে এলেন পার্কার একজন নর্তকী। পার্কারের তৃষিত দৃষ্টি, পুরুষ-সন্ধানী দৃষ্টি যে প্রমথেশের ওপর কখনও পড়ে নি, তাও নয়। তবে, সম্পর্ক ওই পর্যন্তই ছিল। বারের একটি কোণে বসে প্রমথেশ সন্ধ্যা থেকেই মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করতো। এমন ধারার মানুষ তো কতই জমা হয় 'বারে'। তাতে বিশেষ করে প্রমথেশের মতো বাঙালীর ওপর পার্কারের দৃষ্টি পড়ার কথা নয়। কিন্তু পার্কারের সন্ধানী দৃষ্টি

প্রমথেশের প্রতি আকৃষ্ট হয় অন্য এক কারণে। প্রমথেশ বার হলের কোণে বসে কেবল ড্রিঙ্ক করতো তাই নয়, ড্রিঙ্ক করার ফাঁকে ফাঁকে সমগ্র হলের বিভিন্ন মানুষের অঙ্গ-ভঙ্গি, নৃত্য, চটুলতা সে আঁকতো। তাই, সমগ্র ব্যালে ট্রুপেরই দৃষ্টি পড়ে প্রমথেশের ওপর। সবাই, সব মেয়েরাই বলতো, হিয়ার ইজ এ গ্রেট আর্টিস্ট। যখন বারহল বন্ধ হয়ে যেত, তখন ব্যালের অন্যান্য সব মেয়েরাই প্রমথেশের চেয়ারের পিছনে ভিড় জমাতো তার আঁকা ছবিগুলি দেখবার জন্য। কিন্তু পার্কার কোনদিনও প্রমথেশের কাছে এমন ভাবে যায় নি।

পার্কার হেসে বলে, বোধহয় এই ভাবেই অন্যান্য মেয়েদের থেকে নিজেকে একটু স্বতন্ত্র করে প্রমথেশের দৃষ্টি সে আরও বিশেষ করে আকর্ষণ করেছিলো। পার্কার সকল সময়েই প্রমথেশের প্রতি নিরাসক্তভাবেই ডাকাতো। এমন কি যেদিন বারহলে প্রমথেশেরই আঁকা বিরাট অয়েল পেন্টিং 'মিডনাইট ড্রিঙ্ক-ডান্স' ছবিটি টাঙানো হোল, বিরাট এক অনুষ্ঠানের আড়ম্বরতার মধ্য দিয়ে, সেদিনে সকলে, ব্যালের অন্যান্য মেয়েরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসার সঙ্গে অভিনন্দন জানাতে এগিয়েছিল, এককথায় সারি দিয়েছিলই বলা চলে। কিন্তু সেবারেও পার্কার ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ায় নি।

পার্কার আরও হেসে বলে, জানো তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মানুষের সাইকোলজি সম্বন্ধে একটু অভিজ্ঞ হতে হয়। তাই, প্রমথেশের সম্বন্ধে পার্কারের এই ঐচ্ছিক ঔদাসীন্যতার বেশ কাজও হয়েছিল। প্রমথেশ বুঝি তার স্বাতন্ত্র্যটুকু কেবল লক্ষ্য করে নি, ভিতরে ভিতরে পার্কার সম্বন্ধে এক অদম্য কৌতূহল এবং আকর্ষণেও ভরে উঠেছিল। পার্কার হেসে বলে, শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে, তার ট্রিক সার্থক হোল। একদিন মিডনাইট নাচ শেষ করে ফেরার জন্য লিফটের বোতাম টিপে দাঁড়িয়েছে পার্কার, পাশে এসে দাঁড়ালো প্রমথেশ। পার্কার উদাসীন ভাবেই লিফটের জন্য অপেক্ষা করছিলো, প্রমথেশের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই।

লিফট এসে থামতে, পার্কার সেই লিফটে উঠলো, প্রমথেশও তার সঙ্গে নিলো। লিফট যখন মাটির দিকে নামতে থাকে, তখনই প্রমথেশ প্রস্তাব করে বসে পার্কারের কাছে। প্রস্তাব আর কিছুর জন্য নয়, প্রমথেশের মডেল হতে হবে। পার্কার তখন উত্তর দিয়েছিলো, ভাল পারিশ্রমিক পেলে তারা সব কিছুতেই রাজী। স্বল্প বিস্ময়ের ভান করে পার্কার অবশ্য একথাও বলেছিলো প্রমথেশকে যে এতো মেয়ে থাকতে প্রমথেশ হঠাৎ তার কাছেই মডেল হওয়ার জন্য প্রস্তাব করলো কেন? প্রমথেশ উত্তরে বলেছিলো, পার্কারের নাকি শরীরের আউটলাইন চমকপ্রদ। পার্কার রাজী হোল। প্রমথেশ আবার লিফটে করে তার ঘরে চলে গেল।

তারপর থেকেই প্রায় প্রতি দিন, এমন কি মাঝে মাঝে সারা রাত ধরেও পার্কার প্রমথেশের ঘরে সিটিং দিতে লাগলো। সারা হোটেলময় হৈচৈ শুরু হয়ে গেলো, পার্কারের সৌভাগ্যে। এমন কি অনেকে ঈর্ষান্বিত হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ আনলো, পার্কার নাকি হোটেলেই তার ব্যবসা খুলে বসেছে। হোটেলে সব হোতে পারে, কিন্তু ওইসব নয়। ফলে,

পার্কারের ব্যালে ট্রুপ থেকে চাকরিটি গেলো। পার্কার তাতে হতাশ হোল না মোটেই। কারণ ব্যালের নর্তকী হিসাবে সে যা উপার্জন করতো, ডাট তাকে তার তিনগুণ, এমন কি চারগুণ অর্থ পর্যন্ত একটি দিনের সিটিং শেষেই দিতো।

কিন্তু ডাটের ব্যবহারে সব চাইতে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, বরং মুগ্ধ করেছিলো বলা চলে, সে আর কিছু নয় ডাটের নিরাসক্ত চাহনি। জামাকাপড় ওটিয়ে বিশেষ ভঙ্গিমায় বসতো পার্কার, যা সকলের কাছেই লোভনীয়। কিন্তু ডাট তার ইজেলের সামনে থেকে এক সুতোও এগোতো না। কোনদিনও নয়, যতদিন না সেই মুহূর্তটি তাদের মধ্যে এগিয়ে এলো।

সব কিছু বলতে বলতে পার্কার এখানে থামলো বেশ কিছুক্ষণ। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে অনেক আগে। মুখ মুছে নিয়ে একবার চেয়ে দেখলাম প্রমথেশের দিকে। সে এতক্ষণে পাশ ফিরে শুলো। মনে হোল জেগে উঠেছে বুঝি। পার্কারও সন্তর্পণে, নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো। কিন্তু না, এখনও প্রমথেশের ঘুম ভাঙে নি।

পার্কার আবার ফিরে এসে বসলো তার চেয়ারে। আমি বলে উঠলাম, 'তারপর।'

'তারপর।' কিছুক্ষণের জন্য পার্কার স্মৃতির অতলতায় তলিয়ে গেলো। শেষে হাসি ফিরে এলো তার রক্তিম ঠোঁটে। নীল চোখে ধরা দিলো লজ্জা। দৃষ্টি নামিয়ে সে বললো, 'একদিন আমি নিজেই আমার আসন ছেড়ে উঠে এলাম ডাটের ইজেলের পাশে। এতদিন ধরে সে কি ছবি আমার আঁকছে জানার আমার ভারি কৌতূহল হোল। কোনদিনও সে দেখতে দিতো না তার ক্যানভাস। সেদিন জোর করে তার ক্যানভাস দেখতে গিয়ে চমকে উঠলাম।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কেন?'

পার্কার বিস্ময়ের ভঙ্গিমাতেই বললো, 'ডাট এতদিন কোন ছবিই আঁকে নি আমার। কেবল ক্যানভাসের ওপর হিজিবিজি রেখা টানতো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন সে কোন ছবি আঁকে নি? উত্তরে ডাট বললো, এতদিন ধরে সে তার তৃষিতদৃষ্টির তৃষ্ণা মিটিয়েছে। অনেকদিন, অনেক বছর সে কোন নারী-দেহ দেখেনি। তাই, সে তার হাংরি সাইটের ক্ষুধা মেটাতো।' পার্কার কিছুক্ষণের জন্য থেমে বললো, 'আমি তো শুনে অবাক। মানুষ এমনও হয়! সামনেই যার নারী এবং এট হিজ স্যাইট ডিসপোসাল, সে কিনা দেখেই কেবল তৃপ্ত!'

আমি বললাম, 'তখন তুমি কি করলে?'

পার্কারের নীল চোখ সজল হয়ে উঠলো, বললো সে, 'আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ডাটের বুকে মুখ রেখে আমি প্রথম আবিষ্কার করলাম যে ছলচাতুরি দিয়ে যার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়েছিলাম, তাকে আমি আমার নিজেরই অজান্তে কতো ভালবাসি। কতো।'

এরপরের কথা কি ভাবে জিজ্ঞাসা করবো ভাবছি, পার্কার আবার নিজেই তার চোখদুটি মুছে শুরু করলো, 'তারপর শুনলাম ডাটের কাছ থেকে তার জীবনী। তার স্ত্রীর কথা। কত চেষ্টা করলাম তার ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস ত্যাগ করাতে। কিন্তু পারলাম না। শেষে

এই অসুখ দেখা দিলো। হোটেলে থেকে সেবা করা সম্ভব নয়। নিয়ে এলাম ডাটকে আমার ঘরে। আমার ঘরে এসেই ডাট আবার শুরু করলো তার যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে আমার ছবি আঁকতে। ড্রিঙ্ক করাও ছাড়াতে পারলাম না, পারলাম না তার ছবি আঁকার পরিশ্রম থেকে তাকে বাঁচাতে। ফলে শরীরের এই ভয়ানক অবস্থা তার।'

আমি বললাম, 'এ অসুখে ব্যয়ও তো প্রচুর। তুমি কি পারবে সে খরচ চালাতে, না তার স্ত্রীর সাহায্য আনবো।'

পার্কার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'তার কোন প্রয়োজন নেই। ডাট আমায় আজ পর্যন্ত যা দিয়েছে, তাই আগে শেষ হোক। পরের কথা পরে। আর তাছাড়া···।' পার্কারের নীল চোখ আবার সজল হয়ে উঠলো, তার সজল চাহনি তুলে ধরে সে বললো, 'তোমরা ডাটকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও না যেন। তা হোলে আমি আর বাঁচবো না। জানি, আমাদের মতো মেয়েদের ভালবাসার মধ্যে যেতে নেই। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো বন্ধু, ডাটকে ভালবেসে, তাকে পেয়ে আমি আবার নারী হয়ে উঠেছি, আর আমি পণ্যা নেই।'

আমার মনে তখন ঐকতান শুরু হয়ে গেছে পার্কারের ওই 'বন্ধু' ডাকটি শুনে। প্রমথেশের বন্ধু হয়ে উঠতে পারিনি আমি আমার আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু পার্কার, যে সাধনা নয়, যে প্রমথেশকে ভালবেসে আর পণ্যা নেই, নারী হয়ে উঠেছে, সে আমাকে 'বন্ধু' বলে ডেকেছে।

খেয়াল করিনি পার্কার কখন চেয়ার ছেড়ে প্রমথেশের কাছে উঠে গেছে। এখন ফিরে এসে সে বললো, 'তোমায় ডাট ডাকছে।

আমি উঠে গেলাম প্রমথেশের কাছে। খাটের সামনে রাখা চেয়ারটিতে বসে বললাম, 'কেমন বোধ করছো এখন?'

'ভাল নয়।' তারপর তার রক্তিম দৃষ্টি তুলে প্রমথেশ আমাকে বললো, 'তুই এক কাজ কর।'

'বলো, কি করতে হবে আমাকে।'

'সাধনাকে এখুনি একটা টেলিফোন করে দে। সে যেন এখুনি এসে এখান থেকে আমায় নিয়ে যায়।'

আমি স্তম্ভিত। হতবাক। তবু জীবনে এই প্রথম প্রমথেশের মুখের ওপরেই বললাম, 'ভাল করে ভেবে দেখেছো একবার, আজ কাকে তোমার বেশি প্রয়োজন? সাধনা, না পার্কার?'

আমার কথা শুনে আর একবার প্রমথেশ তার তীব্র রক্তিম দৃষ্টি তুলে রাগতভাবেই বললো, 'তোকে যা বলছি, তুই তাই কর। এখুনি যা।' চোখ বুজে আবার পাশ ফিরে শুলো প্রমথেশ।

আমি আর মুখ তুলে তাকাই নি পার্কারের দিকে। তার ঘর ছেড়ে চলে আসার সময় একটা বিদায় সম্ভাষণও জানাই নি। সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি কোনদিকে না দেখেই। সদর দরজায় এসে পড়েছি যখন, তখন চমকে থেমে গেলাম নরম স্পর্শে।

ফিরে দেখি আমার সামনে পার্কার। এলেন পার্কার। যে একদিন এই শহরের অভিজাত হোটেলের ব্যালে গ্রুপে ছিলো, যার শরীরের আউটলাইন প্রমথেশকে মুগ্ধ করেছিলো, যে পণ্যা থেকে নারী হয়ে উঠেছে, সেই এলেন পার্কারের নীল চোখদুটো জলধারায় ভাসছে।

করমর্দনের জন্য তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে পার্কার বললো, 'বন্ধু, আমার কি রইলো?'

পার্কারকে কোন উত্তর দিতে পারি নি। কেবল গভীরভাবে তার হাতদুটি ধরে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর একা নেমে পড়ি পথে।

পুরশ্চরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

বারো

এমন অনেক কিছুই ঘটে যা হয়ত খুবই সাধারণ, যা কিছুদিনের মধ্যেই স্মৃতিতেও থাকে না, সেই রকম ঘটনাও অনেক সময় মানুষের মনে হীরের টুকরোর মতই আদর পায় আর সযত্নে লালিত হয়। সত্যজিতের কাছে দিশারীদের বাড়ীতে যাওয়ার প্রথম দিনটাও এমনি একটি ঘটনা, যাকে সে মনে মনে লালন করে চলেছে। দিশারীর কাকীমাকে কত কাছের মানুষ বলে মনে হয়েছে। উত্তমার দুষ্টুমি মাখা মুখখানা সেদিন চলে আসার সময় কত নরম কত সুন্দর দেখাচ্ছিলো। কত বাজই তো উত্তমা তাকে করেছে, কিন্তু সে জন্যে মনের মধ্যে কোন ক্ষোভ বা বিদ্বেষ জাগেনি, বরং ভাল লেগেছে ওর কথার ধার। সেদিন ওদের বাড়ী থেকে ফেরার সময় সারা পথটায় আর কিছু ভাবেনি সত্যজিৎ ওদের কথা ছাড়া। সন্ধ্যেয় যখন বাড়ী ঢুকেছিলো তখনও মনে তার আমেজ ছিলো। বাড়ীতে ঢুকে সদর ঘরে বইগুলো রেখে অন্ধকারেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভেবেছিল দিশারীকে, কাকীমাকে আর উত্তমাকে। বাড়ীতে ঠাকুমা কেমন আছে, শান্তি চন্দ্রাবলী কোথায়, কি করছে, এ সব কিছুই মনে হয়নি—শুধু সিনেমার ছবির মত উত্তমাদের বাড়ীর ঘটনাগুলো নতুন করে দেখছিলো সত্যজিৎ সেদিন।

তারপর এক সময় উঠে মুখ হাত ধুয়ে রান্নাঘরের সামনে যেতেই দেখলে স্মরজিৎ হাত মুখ নেড়ে শান্তিকে কি যেন বলছে। হয়ত বেড়ানোর গল্প। মেজদা তাহলে ফিরেছে। সত্যজিৎ আর দাঁড়ালোনা, সোজা ছাদে এসে উঠলো। ছাদটা তার বড় ভাল লাগে। ওপরে খোলা আকাশ, মনটা অনেকদূর চলে যায়। ছেলেবেলা থেকেই সন্ধ্যের পর এই ছাদের অন্ধকারকে সঙ্গী করে সত্যজিৎ প্রায়ই একা একা কাটায়। এই ছাদে বসে কত কি ভেবেছে। ঠাকুমার কাছ থেকে শোনা রূপকথা, রামায়ণ, মহাভারতের যুগে মনকে নিয়ে গেছে ঐ খোলা অন্ধকার আকাশ। মিটমিটে তারাগুলো কত বিভিন্ন রূপে তার চোখে ধরা দিয়েছে। আজও এসে বসলো ছিলেকোঠার দরজায়। অন্ধকারে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যজিৎ তারাগুলোর মাঝে দিশারীদের সাদা বাড়ীটা যেন দেখতে পেলো।

নীচে রান্নাঘরে তখন স্মরজিৎ দেওঘরের গল্প শোনাচ্ছিলো শান্তিকে। বেঁটে গোলগাল চেহারাটা স্মরজিতের ছোটবেলা থেকেই। সত্যজিতের মত ভাবুকও নয় স্মরজিৎ। ইচ্ছে হলো

করলে, আর ইচ্ছে হলো না তো করলে না। কথা বলতে ভালবাসে। শ্রোতা থাকলেই হলো, প্রসঙ্গের অভাব হয় না।

—জানিস শান্তি, একটা পাণ্ডাকে আমরা যা জব্দ করেছিলুম।

—কি রকম শুনি? রান্না করতে করতেই বললে শান্তি।

—ফটিককে চিনিস তো? খাইয়ে, পাঁচজনের ভাত একা মারে ও ব্যাটা। আমরা তো পাণ্ডা ঠাকুরের আস্তানায় উঠেছিলুম; টাকা পয়সা সঙ্গে কম। অবশ্য হোটেল থেকে ওখানে পাণ্ডাদের কাছে খাওয়া দাওয়াটা ভালো, সে যাক্ পাণ্ডাবাবাজী ভাবলে মস্ত মক্কেল, কলকাতার বাবু, খাবেও কম, কিন্তু বাবা এ হলো আহিরীটোলার ছেলে। ঘাড় নেড়ে একটু হেসে আবার স্মরজিৎ বললে, তিন দিনেই বাছাধন কাত। চারদিনের দিন জোড় হাত করে বললে—আমার অন্য যজমান মেয়েছেলে নিয়ে এসেছে, আপনারা যদি অন্য জায়গা মানে হোটেলে গিয়ে ওঠেন। আমরা তো ফন্দি করে রেগে গেলুম, তারপর গোলমাল করে চম্পট, ব্যাস পয়সাটা হজম করে দিলুম।—এই বলে স্মরজিৎ একটা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললে, কেমন মজা বল দেখি, তোরা হলে তো পয়সাটা দিয়েই চলে আসতিস।

—তাতো আসতুম, তোমাদের মতো তো চোর চোরটা সাজতুম না তীর্থস্থানে গিয়ে। এখন যাও দেখি তোমাদের আড্ডাখানায়, 'রান্নাঘরে বকবক করলে কাজ হবে না, যাও কাল আবার শুনবো। শান্তির ভাল লাগছে না।

—এলুম গল্প বলতে, শুনবে কেন, খুন্তি নাড়। যাই দেখি তোদের বাড়ীতেই যাই।

—তাই যাও, গিয়ে সিগারেট টানো গে, পেটটা তো ফুলতে আরম্ভ করেছে।

—এই আস্তে—

—বেশ, খাবার বেলা তো আস্তে হয় না, বেশ জোরেই দোঁয়া ছাড়া হয়। আজকাল আবার বিটলেটাও ধরেছে।

—তাই নাকি, বেশ বেশ। হ্যাঁরে সতেটা কোথায়, ভাল আছেতো?

—ভাল থাকবে কি করে শুনি, তোমাদেরই তো ছোট ভাই।

—না, তুই একদম জবুথবু গিন্নি হয়ে গেছিস, রান্নাটা ভালো করে করিস, ফিদেটা যেন মাঠে না মারা যায়। যাই একটু ঘুরে আসি।

আর এদিকে সত্যজিৎ অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে উত্তমাদের নিয়ে কল্পনার জাল বুনে চলেছে। কত কাছের মানুষ ওরা, কত ঘনিষ্ঠ, তার মনের কত কাছাকাছি।

শান্তি ভাবছিলো সত্যজিতের কথা। এখনো কলেজ থেকে ফিরলো না কেন? স্মরজিৎ চলে গেলে শান্তি সদর-ঘরের দিকে এগোয়। টেবিলে রাখা কলেজের বইখাতা দেখে শান্তি বুঝতে পারলো সত্যজিৎ ফিরেছে। কিন্তু জলখাবার খেতে না এসে গেল কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে শেষে ছাদে উঠে এলো শান্তি। দেখে, আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছে সত্যজিৎ।

—এই যে এখানে কপিবর।—শান্তির বক্রোক্তিতে চমকালো সত্যজিৎ।

—বলি ক্ষিদে তেষ্টা কি আকাশের দিকে চেয়েই মেটাবে নাকি।

—খেয়ে এসেছি আমি। আস্তে করে বললে সত্যজিৎ।

—ও, তাহলে মাসীমার কুটুমও জুটেছে, কেমন কুটুমটি জানতে পারি কি?

সত্যজিৎ চুপচাপ, উত্তর দিল না, বিরক্তি বোধ করেছে সে।

—কি, কথা কানে যায়নি নাকি।

—তা যাবে না কেন, ও কথার উত্তর নেই বলেই দিইনি।

—মেজাজ খুব গরম দেখছি যে।

উত্তরে সত্যজিৎ কিছু বললে না।

—আমার বাপু কাজ আছে, খেতে ইচ্ছে থাকে তো খেয়ে যাও। শান্তি ঠিক সহজ হতে পারলো না।

—খাবো না তো আগেই বলেছি।

—ও তাই নাকি, আচ্ছা বসে বসে হাওয়াই খাও। আর দাঁড়ালো না শান্তি, নীচে নেমে গেল।

কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল, মনটা এলোমেলো করে দিলো শান্তি। বেশ ছিল সে।

গভীর রাতে আবার সত্যজিৎ চমকালো মুখুজ্জে বাড়ীর প্রায় সকলের সঙ্গেই।

জোরে কড়া নড়ে উঠতেই ভুবনমোহিনী জেগে উঠলেন, তারপর শান্তিকে ডাকলেন—দেখ শান্তি কে ডাকে এত রাতে।

—ও কেউ নয়, ঘুমোও তুমি।

—কেউ নয় কি রে! আমি যে শুনতে পাচ্ছি। নিজেই উঠলেন, বোয়াক থেকে বিপিনের উদ্দেশ্যে ডাকলেন, বিপিন ও বিপনে।

—কে?

—আমি। দেখতো বাইরে কে কড়া নাড়ছে। বিপিন উঠলেন, বারান্দার আলো জেলে নীচে নেমে এলেন, তারপর মার দিকে চেয়ে বললেন, কি হয়েছে?

—বাইরে দেখ কে ডাকছে।

বাইরে জরুরী পিত্তন, দরজা খুলতেই বললে, টেলিগ্রাম আছে দীননাথবাবুর নামে, সই করে দিন।

—টেলিগ্রাম, দাও। সই করে টেলিগ্রামটি হাতে নিয়ে বিপিন দরজাটা বন্ধ করলো।

—কি ব্যাপার রে? ভুবনমোহিনী প্রশ্ন করলেন।

—বোঠানের মা মারা গেছেন।

—সেকি! মারা গেছে!

—দাদাকে ডাকি, খবরটা দিই।

—তা ডাক। আহা কত ভালো মানুষ ছিলো আমার বেয়ান গো, হাসি ছাড়া মুখ ভার দেখিনি, পুণ্যবতী, স্বামীকে রেখে চলে গেল, আর আমি···গলাটা ধরে যায় ভুবনমোহিনীর।

দীননাথের আগেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিলো, দরজা খুলে তিনি নিজেই বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

—ঐ যে দাদা। কেষ্টনগর থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, বৌঠানের মা মারা গেছেন। ভাস্কর আসছে।

—তাই নাকি? আর কিছু বললেন না দীননাথ, শুধু চোখদুটো বুজে নিঃশ্বাস নিলেন একটু জোরে।

নীচে শান্তি আগেই জেগে ছিলো। এখন বাইরে এলো।

—শুনেছিস তো বেয়ান আমার আর বেঁচে নেই।

—মারা গেছেন দিদিমা!

—হ্যাঁরে আমার বৌমা বোধহয় সেখানে আছাড়ি পিছাড়ি করছে। মাকে বড্ড ভালবাসতো।

—তোমরা শুয়ে পড় মা, কাল সকালে তো ভাস্কর আসছে। দীননাথ বললেন ওপর থেকে, তারপর নিজের ঘরে এলেন। একটু চিন্তা করতে চান যেন দীননাথ কথা না বলে।

ঘরে সত্যজিৎও জেগে উঠেছে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছে আর সকলের কথাবার্তা। বুকের মধ্যে একটা বেদনাও জাগে, দিদিমার খুব ঘনিষ্ঠতা না পেলেও, খারাপ লাগেনি দিদিমাকে। হাসিখুসি মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ঠিক যেন দিশাগ্রীর কাকীমার মত মুখখানা। অনেকটা মিল আছে, মিলিয়ে দেখলে সত্যজিৎ মনে মনে।

—মানুষের জীবনই এমনি, এই আছে তো এই নেই। ভুবনমোহিনী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

—দরজাটা বন্ধ করে দিই।

—দাও। সেবার যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কি ইচ্ছেটাই ছিল, চলুন দিদি একটু বেড়িয়েও আসবেন আর নবদ্বীপটাও ঘুরে আসবেন। কে জানতো ঐ শেষ দেখা হবে! আলোটাও নিবিয়ে দে শান্তি। শান্তি আলোটা নিবিয়ে দিলো।

—বিপদ বন্ধু মধুসূদন, বিপদ থেকে উদ্ধার করো ঠাকুর। ভুবনমোহিনী ত্রাণকর্তাকে ডাকলেন বিছানায় বসে বসে।

শান্তি শুয়ে পড়লো সত্যজিতের কাছ থেকে একটু দূরে। আজ আর কথা হয়নি রাতে শুয়ে শুয়ে। আর এখন তো মনটা কথা বলতে চাচ্ছে না, একটু স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে কয়েকবার দেখা সেই হাসিখুশী মহিলাটিকে।

আর সত্যজিৎ আরো গভীরে, আরো কাছে খুঁজেছে তার দিদিমাকে। আজ সে তার মানস চক্ষে নতুন রূপে দেখলো, যা জীবিত থাকাকালে কোন দিন দেখেনি। হয়ত মানুষ মারা গেলে তার অনেক গুণ নতুন করে উপলব্ধি করে মানুষ। সত্যজিৎও তাই করছে বোধহয়। দিদিমার কাছে কেউ যেন বিশেষ নয়, সবাই সমান, সকলকে কাছে ডাকছে দিদিমা হাসি মুখে, সত্যজিৎ যেন দেখতে পাচ্ছে। কি সুন্দর! কিন্তু আর তো রইলো না, কোথায় চলে গেল, আর কি আসবে—দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক ঠেলে।

(ক্রমশঃ)

আধুনিক সমাজ ও সামাজিক উৎসব

গত কয়েকবছর ধরে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি সামাজিক উৎসবগুলিতে অদ্ভুত বিকৃতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তা স্বভাবতই দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনেকেই উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন এবং তাঁদের একাংশ সব কিছুর দোষ আধুনিক যুগের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পুরাতন (বা 'সনাতন' ?) তপোবনের যুগে ফিরে যাবার সুপারিশ করছেন। এই উৎসবগুলির মধ্যে যে বিকৃতি দেখা যাচ্ছে তা যে সমাজবিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক নয় একথা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু উপরোক্ত এক শ্রেণীর চিন্তানায়কগণ যে রকম 'গেল গেল' আওয়াজ তুলে সামাজিক পশ্চাদপসরণের দাওয়াই দিচ্ছেন, সেই বিধান কতখানি সঙ্গত সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে।

প্রসঙ্গত বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা স্বভাবতই এসে পড়ে। ভারতীয় সমাজধারায় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় গভীর ফাটল ধরেছে, একথা ঠিক। ভারতীয় সমাজ এক যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত। সামাজিক যুগসন্ধিক্ষণ স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি কিছুটা অদ্ভুত একথা অনস্বীকার্য। সম্ভবত বৃটিশ শাসন এই পরিস্থিতির জন্য বহুলাংশে দায়ী।

একথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে না যে ভারতীয় অর্থনৈতিক প্রগতিকে রুদ্ধ করে মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখা বৃটিশ রাজশক্তির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ফলে সামাজিক প্রগতিও বহুলাংশে পঙ্গু হয়ে পড়ে। তবুও ইংরেজের সংস্পর্শে এসে বহুসভ্যতার প্রভাব এদেশে অনিবার্যভাবে পড়েছে। ইংরেজের সাম্রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যিক স্বার্থে সৃষ্ট রেল ও ডাক-ব্যবস্থা সুনিশ্চিতভাবে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর ওপর কঠিন আঘাত হেনেছে। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা এমন এক শিক্ষিত শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে যাঁরা দেশের ভাবধারা এবং মূল্যবোধকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। তাছাড়া গড়ে উঠেছে কতকগুলি নগর যাদের বর্তমান সমাজতান্ত্রিক কাঠামো বহুলাংশে ধনতান্ত্রিক। সমগ্র দেশের উপর এইসব নগরের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবও তুচ্ছ নয়। মোট কথা, বলা চলে যে দেশের স্বাভাবিক প্রগতি ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও প্রাগ্রসর পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এদেশে একটা বর্ণসংকর সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যে সভ্যতায় সর্বাঙ্গীনতার নিতান্ত অভাব। এই সভ্যতার আওতায় নগরেও ধনতান্ত্রিক সমাজধারা সম্পূর্ণতা পায়নি। একদিকে যেমন ধনতন্ত্রের ব্যবসায়িক ধারা (Finance Capital) অগ্রসর, অন্যদিকে শ্রমশিল্প (Industry) তুলনায় নিতান্ত শৈশবে। আবার বহুকালব্যাপী বৈদেশিক শোষণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত, যার প্রতিক্রিয়া

ইংরেজ রাজত্বের অবসানের আট বছর পর এখনও অনুভূত হচ্ছে। আধুনিক নগর-জীবিকায় অবশ্য সামন্ততন্ত্রের কোন পরিচয় নেই, কিন্তু দেশের বৃহত্তর সমাজমানসের প্রভাবে নগরের মানুষ এখনো পুরাতন গ্রামীণ সভ্যতার মূল্যবোধ বিধি-বিধান এবং সামাজিকপ্রথা আঁকড়ে ধরে আছে, যদিও যথার্থজীবনের সঙ্গে যোগ নেই বলে এই মূল্যবোধ সমষ্টি এবং সহচারী অনেক সামাজিকপ্রথা ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হ'য়ে একে একে লয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

ফলে ভাবধারায় এক অভূতপূর্ব অশান্তি এসেছে। পুরাতন বিচার, মূল্যবোধ আর বিশ্বাসকে আর মেনে নিতে পারছি না। প্রচলিত সামাজিক প্রথাগুলির তাৎপর্য লোপ পেয়ে যাবার দাখিল। উচিত-অনুচিতের ব্যবধান প্রায় লুপ্ত। অথচ নাগরিক নববিধানের পঙ্গুতায় নূতন কোন সমাজব্যবস্থা এবং তদনুযায়ী নূতন মূল্যবোধসমষ্টি গড়ে ওঠে নি।

এই অবস্থায় বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। নগরসমাজে আমাদের আনন্দের উপকরণ অসংখ্য এবং অনায়াসলভ্য। কিন্তু বিশৃঙ্খলমানস আনন্দ উপভোগের উপযুক্ত নয়। নাগরিক আমোদপ্রমোদ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাদের আনন্দদায়ী শক্তি হারিয়ে ফেলে। আনন্দকামী অতৃপ্ত মন বৃথাই এক উপকরণ থেকে অন্য উপকরণে ছুটোছুটি ক'রে আনন্দ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। এই অবস্থা প্রায়শঃই দৃষ্টিভঙ্গিকে পশ্চাদাভিমুখী করে তোলে। ইতিহাসের অসম্পূর্ণ ধারণায় অতীতের সব কিছুই মধুময় বলে মনে হয়। আগে বারো মাসের তের পার্বণের মধ্যে যে আনন্দ পেতাম, মরিয়া হয়ে শেষে সেই উৎসবগুলির মাধ্যমে আনন্দের সন্ধান করি। কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশে সেই সব উৎসব-অনুষ্ঠান বর্ণসংকর সভ্যতার পঙ্গুতায় অর্থহীন বিকৃত উল্লাস ছাড়া আর কিছুই আমাদের দিতে পারে না।

আগে দোল-দুর্গোৎসব ও বারো মাসে তের পার্বণ ঋতু-পরিবর্তনের মতই সহজ নিয়মে আসত-যেত। সাধারণ মানুষ সহজ নিয়মেই উৎসব পালন করত সংশয়বিহীন সহজ আনন্দে। উৎসবের যথার্থতা নিয়ে তারা বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিল না, উৎসব পালনেই ছিল তার সার্থকতা। বর্তমানে সব কিছুই দেখি আমরা প্রয়োজনের কষ্টিপাথরে বিচার করে, তাই আনন্দও হিসেবের খাতায় বন্দী। আধুনিক আনন্দ ব্যক্তিভিত্তিক, তার সমষ্টিগত রূপ ক্রমশঃ বিলুপ্ত। এই পরিস্থিতিও অস্বাভাবিক নয়। স্থিতিশীল সমাজে যখন প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাস থাকে দৃঢ়তর, বৈষয়িক জীবনে স্বাভাবিক প্রাচুর্য থাকলে সামাজিকপ্রথা উৎসবাদি সহজ নিয়মেরই অনুগামী হবে এটা আশা করা যায়, কিন্তু পরিবর্তনমুখী সমাজে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। বর্তমান ব্যক্তিভিত্তিকতা ধনতান্ত্রিক সমাজের অনুচর, বর্তমান ভারতীয় বর্ণসংকর সভ্যতায় বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রাধান্যলাভ করেছে মাত্র, যা ধনতান্ত্রিক সমাজের আনুসঙ্গিক পরিবেশে এতটা ঔৎকটা লাভ করত না।

প্রসঙ্গত একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে বর্তমান নাগরিক মানসিকতার সঙ্গে পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম-মানসের ব্যবধান বিস্তর। গ্রাম-মানসের বৈশিষ্ট্য সৌহার্দ্যে—মানুষের মধ্যে সহজ সম্পর্কে। এগুলি নাগরিক মানসিকতা থেকে বিচ্যুত। নাগরিকের জীবনে দ্রুততা, জীবিকায় সহজ ব্যক্তিসম্পর্কের বিলুপ্তি, মানসিকতায় আত্মপরায়ণতা এবং হৃদয়বিচ্ছিন্ন

বুদ্ধিনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাগরিক আনন্দানুষ্ঠান বা আমোদপ্রমোদ যে রূপান্তর দাবী করে সেই দাবী দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি প্রাচীন সামাজিক উৎসবগুলি মেটাতে কতদূর সক্ষম সে প্রশ্ন অবান্তর নয়।

প্রশ্ন উঠবে, কেন আগে কি নগর ছিল না? তখন কি নগরে সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা হত না, না তখনও উৎসবের নামে এই উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল?

আগেও শহর ছিল, আর এখনও গ্রাম আছে। কিন্তু তাদের স্বরূপ আলাদা। আগেকার শহরকে একহিসেবে বলা চলে গ্রামাশহর—গ্রামীণ সভ্যতার পীঠভূমি। আর এখনকার গ্রামেও পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে। অন্তত আচারের বহিরঙ্গে যে একালের গ্রাম ভিন্নধর্মী নগরের অনুকরণকারী, তা স্পষ্ট। তাই আজ গ্রামের উৎসবের ধারাও নগরের অনুরূপ একই উৎকট উল্লাসে, রুচিবিকারে ও সৌন্দর্যহীনতায় পর্যবসিত।

স্বভাবতই মনে হবে, তবে কেন এই অস্থির সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে দিশাহারা পথ পরিক্রমা। প্রাক্তন সমাজে যদি একটা সুনির্দিষ্ট ভাবধারা ছিল বলে স্বীকার করি, যার ফলে সমাজমানসের এই অশান্তি অনুপস্থিত ছিল বলে ধরে নিই, তবে কেন সেই সমাজব্যবস্থাতেই ফিরে যাব না? যাঁরা এই মতাবলম্বী তাঁরা সম্ভবত ভুলে যান যে সমাজ গতিশীল (Dynamic)। প্রাক্তন সমাজব্যবস্থায় যে পরিস্থিতি ছিল তা সামগ্রিকভাবে বর্তমানে উপস্থিত নেই, তার অনেক কিছুই বদলে গেছে। চাষ করার জন্য যে চাষা লাঙ্গল কিনেছিল, সে যদি মিলে এসে কাজ নেয় তবে তার লাঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা যে আর থাকবে না একথা মেনে নিতেই হয়। পৌরোহিত্যের জন্য যে ব্রাহ্মণ সম্মানার্হ সে যদি পাটের দালাল হয় তবে অনুকারণে সে সম্মানার্হ থাকলেও পৌরোহিত্যের প্রাপ্য সম্মান তাকে দেওয়ার কোন কারণ নেই। সমাজেও বৈষয়িক (Economic) পরিস্থিতির রূপান্তর সামগ্রিকভাবে সামাজিক পরিস্থিতিকেই নবরূপায়নের সমুখীন করেছে।

তাই আতঙ্কিত হবার কোন কারণ ঘটেছে বলে মনে হয় না। ইতিহাসের নিজস্ব ধারায় সমাজ আপনার পথ ধরে এগোয়। শৈশবে বড় আনন্দে ছিলাম মনে করে কিশোরের পক্ষে খোকামি করতে যাওয়া হাস্যকর। আমাদের সমাজও পূর্ণতা লাভ করছে। বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে নব কলেবরে ভারতীয় সমাজও আনন্দের নব রূপ উপলব্ধি করবে। ভারতে বৈদেশিক প্রভাব ও শোষণ সমাজে কিছুটা নূতন পরিস্থিতি ও অকালপক্কতা এনে দিয়েছে মাত্র। এখন স্বাভাবিক নিয়মেই সে দোষ শোধরাচ্ছে। অতএব, সামাজিক বহিরঙ্গে অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বলেই ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টাকে সমর্থন করা চলে না। এই অবক্ষয় যেমন প্রাক্তন সমাজব্যবস্থার মৃত্যুর নিশানা, তেমনি নূতন সমাজের আগমনী ঘোষণা করছে।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

অন্যবার ছিল আধিক অনটন, এবার প্রকৃতির পরিহাস। পরিহাসই বলব। নইলে যে বছর অর্থের একটু সুসার ঘটল, ঠিক সেই বছরই অধিবেশন সুরু হওয়ার আগের দিন হঠাৎ মণ্ডপে আগুন লেগে সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে কেন। তবু যে নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ পরের দিন যথাসময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে, এতে উদ্যোক্তাদের আত্মবিশ্বাস ও আন্তরিকতা আর একবার প্রমাণিত হল।

অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া কম কথা নয়। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে উদ্যোক্তাদের এ-ক্ষমতা বার বার লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সদস্যদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তির ব্যবহার শোভনতার সীমা অতিক্রম করেছে। একথা ঠিক যে কিছু সংখ্যক সদস্যের আচরণ প্রতিবাদযোগ্য, তবু নিঃসন্দেহেই বলা যায় অধিকাংশ সদস্য রসিক ও সজ্জন। কয়েক হাজার সদস্যের রুচি সমান নয়। সেক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে বিভিন্নতাই প্রত্যাশিত। কেউ হয়ত ভালবাসেন লোকসঙ্গীত, কেউ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, কারো ভাল লাগে কীর্তনগান, কারো নাট্যাভিনয়; আবার এমন লোকও দেখেছি, সব কিছু থেকে রস গ্রহণ করার দুর্লভ ক্ষমতা যাঁর মধ্যে আছে। তবে ভাল লাগা মন্দ-লাগার প্রশ্ন এখানে প্রধান নয়। তার কারণ নিহিত রয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যেই। বিভিন্ন প্রসঙ্গে সম্মেলন-কর্তৃপক্ষ সে-সম্পর্কে একাধিকবার বিশদভাবে বলছেন। গত সংখ্যায় আমরাও তা নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করেছি। এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, অর্থোপার্জনের ফিকিরে অথবা হুজুগে যেতে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ পক্ষকালব্যাপী বাৎসরিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান করেন না। সম্মেলনের অধিকাংশ সদস্যই এ-বিষয়ে সমাক অবহিত আশা করি। গত তিন বছর ধরে যাঁরা সদস্য হিসেবে সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা ত বটেই, এমন কি নতুন সদস্যরাও। পক্ষকালব্যাপী অধিবেশন সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে চলার জন্যে একদিকে যেমন দরকার সদস্যদের পরিপূর্ণ সংযোগিতা, তেমনি দরকার সর্ববিষয়ে সুব্যবস্থা এবং সম্মেলন কর্তৃপক্ষের অসীম ধৈর্যশীলতা।

এবারের অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়ন অনেক সুপরিকল্পিত হয়েছে বিনা দ্বিধায় বলা চলে।

তবে নাগরিক সংস্কৃতিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে—তুলনায় পল্লীঅঞ্চলের লোকসঙ্গীত ও নৃত্য অত্যন্ত কম পরিবেশিত হয়েছে। গত দু বছর অবশ্য এর উল্টোটাই ঘটেছিল। প্রতি বছরের মত বঙ্গ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতার বন্দোবস্ত এবারেও করা হয়েছিল। বক্তারা

সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং বহু বছর যাবৎ গবেষণা কার্যে নিযুক্ত আছেন। আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান এবং বর্ষীয়ান লেখক ও গবেষককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের প্রবর্তন এ-বছরই প্রথম করা হল। শেষোক্ত অনুষ্ঠানটি সত্যিই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনাগুলির ভন্তে আরো বেশী দেওয়া উচিত ছিল। ঐদিন আর কোন বক্তৃতা কিম্বা সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা না করলেই সবচেয়ে ভাল হত।

পল্লী অঞ্চল থেকে আগত শিল্পীদের মধ্যে বীরভূমের গোপাল বাবাজী, নবনী দাস, পূর্ণ দাস এবং হাওড়ার কানাই বাউলের গান সবচেয়ে ভাল লাগল। এর মধ্যে গোপাল বাবাজীর গানে বাউলদের সাধক রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে আর নবনী দাসের গানে আনন্দের রূপটি। পূর্ণ দাসের নৃত্য সহযোগে দরাজ কণ্ঠের গান সকল শ্রোতার কাছে উপভোগ্য হলেও তার পতন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। তার গানে আধুনিক সুরের মারপ্যাঁচ এসে গেছে। উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা নৃত্য-গীতও সকলকে আনন্দ দিয়েছে।

শ্রীনির্মল চৌধুরী সম্প্রতি লোকসঙ্গীত গেয়ে কলকাতায় বেশ নাম করেছেন। গত বছর মহম্মদ আলী পার্কে পরিবেশিত তাঁর গান সকলকেই তৃপ্তি দিয়েছিল। কিন্তু এবার তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছেন নতুন কিছু করতে গিয়ে। গ্রন্থনার ত্রুটি ও অনাবশ্যক দীর্ঘতার জন্যে তাঁর পরিচালিত অনুষ্ঠানটি দানা বাঁধেনি।

বাংলা নাটকের আদি যুগের দুজন নাট্যকার মধুসূদন ও দীনবন্ধুর দুটি প্রহসন অভিনয়ের অনুষ্ঠানই এবার সবচেয়ে সার্থক হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত প্রহসনের অভিনয় এযুগে জমিয়ে তোলা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। "শ্যামা" নৃত্যনাট্যের অভিনয়ও মোটামুটি ভাল লাগল। "আবোলতাবোল" ছোট বড় সকলকেই আনন্দ দিয়েছে। যাত্রার পালা কোনটিই জমেনি। গত দুবছরও এই অবস্থাই ঘটেছিল। আশা করি উদ্যোক্তারা আগামী বছর এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

পনেরো দিনের সব অনুষ্ঠানই যে উচুদরের হয়েছে তা নয়। কোন কোন অনুষ্ঠান রীতিমত বিরক্তি উৎপাদন করেছে। তবু সব মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে ভালর সংখ্যাই বেশী। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই পনেরো দিন মহম্মদ আলী পার্ক একটা মেলায় পরিণত হয়; নানা লোকের সঙ্গে দেখা-শোনা আলাপ-পরিচয়ের এমন স্থান বোধহয় আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সিদ্ধার্থ সেন

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও ২, স্যারহর লেনস্থ টেম্পল প্রেস হইতে মুদ্রিত।

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

তৃতীয় বর্ষ : ১৩৬২

কবিতা॥ সম্ভাবিতাকে : গোবিন্দ ভট্টাচার্য ১৮॥ রাত-কন্যা : প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯॥ উত্তরবসন্ত : সুবোধকুমার গুপ্ত ২০॥ ঢের শালিক দেখেছ : সত্যেন্দ্র আচার্য ২১॥ স্বপ্নসঙ্গী : সন্তোষকুমার অধিকারী ২২॥ পেয়ালা : ডি, এইচ, লরেন্স ২৩।

গল্প॥ বাগান : সচ্চিৎশেখর মজুমদার ১৩॥ নোঙর : রবীন্দ্র সেনগুপ্ত ৪১।

উপন্যাস॥ পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০।

গ্রন্থপরিচয়॥ হীরেন বসু ৫২।

সমাজসমস্যা॥ হীরেন বসু ৫৪।

শ্রাবণ

প্রবন্ধ॥ ডায়লেক্‌টিক্‌স্ : অতুলচন্দ্র গুপ্ত ৯॥ বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা : রথীন্দ্রনাথ রায় ২৪।

কবিতা॥ অপেক্ষার দীপ : মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১৭॥ কপোতের প্রার্থনা : অনিরুদ্ধ কর ১৮॥ অনির্বচনীয় : হেনা হালদার ১৯॥ কী বলবে : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০॥ মরণের পরে : সি, জি, রসেটি ২১॥ ঘড়ি : চার্লস বোদলেয়র ২২।

গল্প॥ হিরোইন : প্রকাশ পাল ৩৫॥ উড়ো মেঘ : অনিলকুমার দলুই ৪১।

উপন্যাস॥ পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩।

ভাদ্র

প্রবন্ধ॥ বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা : রথীন্দ্রনাথ রায় ৯॥ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর-দলন : সোম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭॥ শিল্পদৃষ্টি : নারায়ণ চৌধুরী ২৪।

কবিতা॥ তুমি এলে : বিভূতি ভট্টাচার্য ৩০॥ শ্রাবণ-সম্ভবা : বেণু দত্ত রায় ৩১॥ ময়দানের সংলাপ : অশ্রুকুমার সিকদার ৩৩॥ ভোর হবে : কবিরুল ইসলাম ৩৪॥ বাতাসের স্বর : নিকোলাউস লেনাউ ৩৫।

গল্প॥ পশ্চাদভূমি : মৃগাঙ্কনাথ ঘোষ ৩৬।

উপন্যাস॥ পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪।

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ॥ হীরেন বসু ৪৯।

গ্রন্থপরিচয়॥ একতারা (সন্তোষকুমার দে) : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৫২।

সমাজসমস্যা॥ উদার স্বার্থপরতা : নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৫৩॥ সৃতশিল্পের সঙ্কট : অবিনাশ দত্ত ৫৪।

আশ্বিন

অবনীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা

প্রবন্ধ॥ সাবেকী কথা : অসিতকুমার হালদার ১৯॥ আফ্রিকার কথা : অন্নদাশঙ্কর রায় ৪১॥ শরৎসাহিত্যের ভূমিকা : রথীন্দ্রনাথ রায় ৪৩॥ মণিপুরী মৃতা : শ্রীমতী ঠাকুর ৬১।

কবিতা॥ আশাবরী : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২৩॥ অভিযোগ : গোপাল ভৌমিক ২৪॥ অসম্ভব : সমরপতি সিংহ ২৬॥ বৃষ্টি : সরিৎ শর্মা ২৭॥ পাঁশুটে আকাশ : সন্তোষ দাস ২৮॥ আরেক পৃথিবী : লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ৩০॥ বেহালা : কৃতাস্তনাথ বাগচী ৩১॥ সৌন্দর্যের দৃষ্টি : চার্লস বোদলেয়র ৩২।

গল্প : এ জন্মের স্বপ্নভঙ্গ : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩॥ সৎকার : রণজিৎকুমার সেন ৫৩॥ একটি পাক-শারদীয় কাহিনী : দীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৬৪॥ গ্রন্থি : দক্ষিণারঞ্জন বসু ৬৯।

কার্ত্তিক

প্রবন্ধ॥ সাবেকী কথা : অসিতকুমার হালদার ৯॥ সমাজধর্মী সত্যেন্দ্রনাথ : কমলা দাশগুপ্ত ২৬॥ সমকালীন লেখকের দায়িত্ব : নারায়ণ চৌধুরী ৪৩।

কবিতা॥ প্রাচীন কবিতা থেকে : সুনীল চট্টোপাধ্যায় ২০॥ আকাঙ্ক্ষা : সমীরণ গুহ ২১॥ সপ্তকে : অসীম সেনগুপ্ত ২২॥ সোনার নূপুর : সুরজিৎ বসু ২৩॥ একটি পাহাড়ী সন্ধ্যা : অজিতকুমার হাইত ২৪॥ অচেনা গন্ধ : চার্লস বোদলেয়র ২৫।

গল্প॥ ক্ষণবসন্ত : ভবানী মুখোপাধ্যায় ১২॥ সুসান : অমল দত্ত ৩১।

উপন্যাস॥ পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা॥ দেহ ও দেহাতীত : রাগাল ভট্টাচার্য ৫০।

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ॥ বৈকুণ্ঠের উইল নাট্যানুষ্ঠান : হীরেন বসু ৫৪।

অগ্রহায়ণ

প্রবন্ধ॥ সবুজ-শিল্পী-কথা : নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম ৯॥ কেমন করে বাঁচব : সনৎ রায় চৌধুরী ৩৭॥ সাবেকী কথা : অসিতকুমার হালদার ৪২॥ সমাজ ও ব্যক্তিত্ব : অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ৪৫।

কবিতা॥ চিরন্তন : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ৩১॥ বিচিত্র : শংকর চট্টোপাধ্যায় ৩২॥ পদচারণ : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ৩৩॥ যদি : কৃষ্ণ দাস ৩৪॥ সূর্যসম্ভবা : প্রবোধবন্ধু অধিকারী ৩৫॥ দোঁহে : হুগো ফন্ হফ্‌মান্‌স্থাল ৩৬।

গল্প॥ হরসুন্দর : অবধূত ২৪।

উপন্যাস॥ পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭।

গ্রন্থপরিচয়॥ ৪৫।

পৌষ

প্রবন্ধ॥ অবনীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী : সোমেন বসু ৯॥ ভরতনাট্যম : শ্রীমতী ঠাকুর ২৫॥ বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' : রথীন্দ্রনাথ রায় ২৮।

কবিতা॥ এ জীবনে তুমি আছ : রণজিৎকুমার সেন ১৮॥ দূরময়ী : সুশীলকুমার গুপ্ত ১৯॥ প্রত্যয় : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ২০॥ প্রস্ফুটিত : সুশান্ত ঘোষ ২১॥ মাঠে মাঠে মাঘ রাত : সুনীল বসু ২২॥ একটি কবিতা : চার্লস বোদলেয়র ২৩।

গল্প॥ ময়লা মলাট : হীরেন বসু ৩৩।

মাঘ

ফাল্গুন

চৈত্র

সম্পাদক : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী
পরিচালক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত।